
সাজঘর
হুমায়ূন আহমেদ



সাজঘর

১

কেরোসিনের চুলায় জাম্বো সাইজের এক কেতলি। মজনু পাশে বসে আছে—একটু পর-পর কেতলির মুখ তুলে পানি ফুটছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করছে। তার হিসেব মতো ইতোমধ্যে পানি ফুটে যাওয়া উচিত। অথচ ফুটছে না। ব্যাপারটা কি?

মজনুর বয়স তের-চৌদ্দ কিন্তু দেখায় অনেক বেশি। তার মুখ চিমসে গিয়েছে, গালের হাড় উঁচু, মাথার চুল জায়গায় জায়গায় পড়ে গেছে। উপরের পাটির দুটি দাঁত ভাঙা। ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে থুথু ফেলা ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ছেলেমানুষী নেই।

মজনু 'পূর্বা নাট্যদলের' টি বয়। এদের সঙ্গে সে গত তিন বছর ধরে লেগে আছে। তার কাজ হচ্ছে রিহার্সেল চলাকালীন সময়ে এক শ' থেকে দেড় শ' কাপ চা বানানো। এর বিনিময়ে মাসে সে নব্বুই টাকা করে পায় এবং রিহার্সেলের এই ঘরে রাতে ঘুমুতে পারে। এমন কোনো লোভনীয় চাকরি নয়। প্রতি সপ্তাহে মজনু একবার করে ভাবে চাকরি ছেড়ে দেবে। ছাড়তে পারে না। তার নেশা ধরে গেছে। রিহার্সেল না শুনলে তার ভালো ঘুম হয় না। বৃহস্পতি এবং শুক্র এই দু'দিন রিহার্সেল হয় না। মজনুর খুব অস্থির লাগে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই কথা ভেবে এখন থেকেই মজনুর মেজাজ খারাপ। মেজাজ খারাপ হলে সে কিছুক্ষণ পর পর দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলে। এখনো ফেলছে এবং আড়ে আড়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ দেখে ফেললে কপালে যন্ত্রণা আছে। তার থুথু ফেলা কেউ সহ্য করে না।

প্রণব বাবু দরজা দিয়ে ঢুকলেন। মজনু অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে পড়ল। প্রণব বাবুকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে মনে মনে বলে, 'হারামজাদা মালাউন।'

'মজনু।'

মজনু জবাব দিল না। তাকালও না।

'মজনু, জল ফুটল নাকি রে?'

'না।'

'চুলায় আগুন আছে নাকি দেখতো, তুই দেখি রাত বারটা বাজাবি।'

মজনু প্রণব বাবুর উল্টোদিকে মুখ নিয়ে খুব সাবধানে একদলা থুথু ফেলে মনে মনে বলল, 'হারামজাদা কুত্তা।'

এই দলের দু'জন লোককে মজনু সহ্য করতে পারে না। এক জন প্রণব বাবু অন্যজন জলিল সাহেব। অথচ এই দু'জনই নিতান্ত ভালোমানুষ। বিভিন্ন উপলক্ষে মজনুকে টাকা–পয়সা দেন।

প্রণব বাবু পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে মজনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মধুর স্বরে বললেন, 'পাঁচটা ফাইভ–ফাইভ নিয়ে আয়। বিদেশি। যাবি আর আসবি।'

মজনু বেরিয়ে গেল। বিদেশি সিগারেট আনতে তার খুব আগ্রহ। দেশিটাই সে কেনে, কেউ ধরতে পারে না। সব বেকুবের দল। অথচ তারা নিজেরা তা জানে না। পৃথিবীতে বোকার সংখ্যা এত বেশি কেন এই জিনিসটা নিয়ে প্রায়ই মজনু ভাবে।

রিহার্সেল হয় পুরানা পল্টনের জনতা পাবলিক লাইব্রেরির হল ঘরে। দুটো চৌকি একত্র করে একটা স্টেজ তৈরি করা আছে। এই পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা পূর্বা নাট্যদলের সঙ্গে জড়িত বলে এখানে রিহার্সেলের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে বেশিদিন পাওয়া যাবে না। হল ঘরটা লাইব্রেরির রিডিং রুম হয়ে যাবে।

হল ঘরে নাটকের পাত্র–পাত্রীরা উপস্থিত হচ্ছে। মহড়া শুরু হতে দেরি হচ্ছে; কারণ আসিফ এখনো এসে উপস্থিত হয় নি। আসিফের স্ত্রী লীনা অনেকক্ষণ হল এসেছে। অন্য কোনো মেয়ে এখনো উপস্থিত হয় নি।

লীনার বয়স পঁচিশ–ছাব্বিশ। তাকে কখনো সে রকম মনে হয় না। হালকা পাতলা গড়নের জন্যে আঠারো উনিশ বছরের তরুণীর মতো মনে হয়। লীনার মুখটি স্নিগ্ধ। তবে আজ তাকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মিজান বসেছে লীনার পাশে। সে জিজ্ঞেস করল, 'ভাবি আপনার শরীরটা কি খারাপ?'

লীনা জবাব না দিয়ে হাসল। যে হাসির মানে হচ্ছে—শরীর ভালোই আছে।

মিজান বলল, 'আসিফ ভাই দেরি করছেন কেন জানেন?'

'জানি।'

লীনা আবার হাসল। তার হাসি রোগ আছে। যে কোনো কথা বলবার আগে একটু হলেও হাসে। এবং কথা কখনো পুরোপুরি বলে না।

মিজান বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানলে বলুন। আপনি অর্ধেক কথা বলেন, অর্ধেক পেটে রেখে দেন, বড় বিরক্ত লাগে।'

লীনা বলল, 'ও তার বোনের বাসায় যাবে। ওর ভাগ্নির শরীর খারাপ। ওখানেই মনে হয় দেরি হচ্ছে।' মিজান ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কোনোদিন টাইমলি রিহার্সেল শুরু করতে পারি না। কোনো মানে হয়?'

লীনার বেশ মজা লাগছে। মিজানের কথা বলার ভঙ্গিটাই মজার। এমন ভাবে সে কথা বলে যেন পুরো নাটকের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। অথচ সে এই বছরেই মাত্র গ্রুপে জয়েন করেছে। নাটকে এখনো কোনো রোল পায় নি। পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। মিজানের গলাটা মেয়েলি। তবে এ নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই। সে যে লেগে

থাকতে পারছে এতেই সে খুশি।

মিজানদের থেকে একটু দূরে জলিল সাহেব কয়েকজনের সঙ্গে নিচু গলায় আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা ঠিক না। কথা বলছেন জলিল সাহেব একাই। অন্যরা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। আদিরসের গল্প। জলিল সাহেব আদিরস বিষয়ক রসিকতা অতি চমৎকার করেন। তবে সব সময় করেন না। এমন সময় করেন যখন আশেপাশে মেয়েরা কেউ থাকে। আজ লীনা কাছেই আছে।

জলিল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'গল্পটা হচ্ছে একটা ভীমরুল নিয়ে। ভীমরুল হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। ভীমরুল হুল ফোটালে কী হয় জান তো? ফুলে বিশাল হয়ে যায়। এখন চিন্তা কর, এক জন লোকের একটা বিশেষ জায়গায় যদি ভীমরুল হুল ফোটায় তাহলে?'

জলিল সাহেবের কথা শেষ হল না, তার আগেই একেকজন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

লীনা বলল, 'মিজান, ওরা হাসাহাসি করছে কী নিয়ে জান?'

মিজান বলল, 'জলিল সাহেব আজেবাজে গল্প বলেন, ঐ নিয়ে হাসাহাসি হয়।'

'আজেবাজে গল্প মানে কী রকম গল্প?'

'বাদ দেন তো ভাবি!'

জলিল সাহেবের গল্প আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। আবার সবাই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। ঘরের ভেতর খুব গরম লাগছে। লীনা বারান্দায় চলে এল। বারান্দা থেকেই দেখল মেয়েরা সব চলে এসেছে। মেয়েদের আনার জন্যে একটা গাড়ি যায়। নতুন মেয়েটির আজ আসার কথা, সে এসেছে কিনা কে জানে।

মজনু চা বানাচ্ছে। প্রথম কাপটা সে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিল।

লীনা বলল, 'চা খাব না রে। গরম লাগছে?'

'ঠাণ্ডা কিছু আইন্যা দিমু?'

'না।'

'আফনের শইলডা কি খারাপ আফা?'

'না—শরীর খারাপ না।'

লীনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার শরীরটা আসলেই খারাপ। কেন খারাপ তা সে নিজেও ঠিক জানে না। রাতে ঘুম ভালো হচ্ছে না। একবার ঘুম ভাঙলে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

যে চার জন মেয়ে এসেছে তাদের এক জন আজই প্রথম এল। শ্যামলা একটি মেয়ে, মুখ থেকে বালিকা ভাবটা এখনো যায় নি। সে অবশ্য লালমাটিয়া কলেজে আই এ পড়ছে। এবার সেকেন্ড ইয়ার। ভালো নাম ইসরাত বেগম। সবাই অবশ্যি তাকে পুষ্প–পুষ্প ডাকছে।

মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব লজ্জা পাচ্ছে, তবে কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছে। সে একা পড়ে গেছে। অন্য মেয়েরা জলিল সাহেবের কাছে চেয়ার টেনে বসেছে। জলিল সাহেব ভূতের গল্প শুরু করেছেন। ভূতের গল্পগুলো অবশ্যি আদিরসের গল্পের মতো জমছে না।

লীনা বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে ঢুকল। পুষ্পের পাশের চেয়ারে এসে বসল। হাসি

মুখে বলল, 'নাম কি তোমার?'

'পুষ্প।'

'বাহ্ খুব ভালো নাম।'

বলে লীনা নিজেই একটু লজ্জা পেল। 'বাহ খুব ভালো নাম তো—' এই জাতীয় কথাগুলো সাধারণত ছোট বাচ্চাদের বলা হয়। এই মেয়েটি ছোট বাচ্চা নয়।

'তুমি কি আগে অভিনয় করেছ?'

'জ্বি না। আমি হয়ত পারব না।'

'কেন পারবে না। নিশ্চয়ই পারবে। অভিনয় কঠিন কিছু না। আমি যদি পারি তুমিও পারবে।'

'বাসা থেকে করতে দেবে কিনা তাও তো জানি না।'

'সে কি। বাসায় কাউকে কিছু বল নি?'

'জ্বি না।'

'বল নি কেন?'

'বাসায় বললাম, তারপর এখানে কিছু পারলাম না, আপনারা বাদ দিলেন—'

লীনা খানিকটা অবাক হল। এই মেয়েকে যতটা লাজুক শুরুতে মনে হচ্ছিল, এ ততটা লাজুক নয়। গলার স্বর পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ পারবে। লীনা বলল, 'আমাদের দিকটাও কিন্তু তুমি দেখ নি। ধরা যাক আমরা তোমাকে নিলাম, তারপর বাসা থেকে বলল— হবে না। তখন আমরা ঝামেলায় পড়ব না?'

'আমি আপনাদের দিকটা ভাবি নি, আমি শুধু আমার নিজের দিকটাই ভেবেছি।'

'সবাই তাই ভাবে পুষ্প।'

নাটকের পরিচালক বজলু ভাই এসে ঢুকলেন। আজ তিনিও দেরি করেছেন। অসম্ভব রোগা, অসম্ভব কালো এবং প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা এক জন মানুষ। খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন বলে তাঁর অন্য নাম হচ্ছে 'হাঞ্চ ব্যাক অব মিরপুর।'

বজলু ভাই এসেই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা বসে আছ কেন? শুরু করে দিলেই হত।'

জলিল সাহেব বললেন, 'আপনি নেই, শুরু করব কী ভাবে?'

'আমি না থাকলে শুরু হবে না, এটা কেমন কথা?'

'আসিফ ভাইও এখনো আসেন নি।'

'বল কী? এদের হয়েছে কী? দেখি চা দিতে বল। চা খেয়ে ম্যারাথন। আজ ফুল রিহার্সেল হবে। নতুন মেয়ে একটা আসার কথা। এসেছে? কুসুম কিংবা পুষ্প এই জাতীয় নাম।'

পুষ্প উঠে দাঁড়াল। বজলু সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। পুষ্প খুব অস্বস্তি বোধ করছে। এতক্ষণ কেউ তেমন করে তার দিকে তাকায় নি, এখন একসঙ্গে সবাই তাকাচ্ছে।

'তোমারই নাম কুসুম?'

'আমার নাম পুষ্প।'

'একই ব্যাপার। তৈলাধার পাত্র কিংবা পাত্রাধার তৈল—অভিনয় করেছ কখনো?'

'জ্বি না।'

'এইতো একটা ভুল কথা বললে—অভিনয় তো আমরা সারাক্ষণই করছি। করছি না? বাড়িতে মেহমান এসেছে, তুমি খুব বিরক্ত, তবু তার সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করতে হচ্ছে। দেখাতে হচ্ছে যে তুমি আনন্দিত। এটা অভিনয় না? অভিনয় তো বটেই। কঠিন অভিনয়। আমাদের প্রতিনিয়ত অভিনয় করতে হয়।'

পুষ্প তাকিয়ে আছে। এই লোকটিকে তার পছন্দ হচ্ছে না। কথা বলার সময় লোকটির মুখ থেকে থুথু ছিটকে আসছে। আর কথা বলছে কেমন মাস্টারের ভঙ্গিতে। কথাবার্তায় একটা সবজান্তা ভাব। এই রকম সবজান্তা লোক তার ভালো লাগে না।

'পুষ্প।'

'জ্বি।'

'তুমি একটা কাজ কর। একটু দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসে দাঁড়াও। তারপর তুমি তোমার মাকে ডাক। এমন ভাবে ডাকবে যেন তাঁকে তুমি জরুরি খবর দিতে চাচ্ছ।'

'কী খবর?'

'মনে কর একটা দুঃসংবাদ।'

পুষ্প তাই করল। যদিও তার মোটেও ভালো লাগছে না। একটু দূর থেকে হেঁটে এসে বলল, 'মা, মা।'

বজলু সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'কিছুই তো হল না, আবার কর।'

পুষ্পের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে একবার ভাবল কিছু করবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তা কি ঠিক হবে? সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। পুষ্প আবার একটু দূরে সরে গেল। এগিয়ে এল জড়ানো পায়ে। আবার ডাকল, 'মা, মা।'

বজলু সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রোবটের মতো কথা বলছ। ফ্রিলি বল। পরিষ্কার গলায় বল। জায়গাটা আবার কর।'

পুষ্প বলল, 'আর করব না, আমার ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না মানে?'

'আমি অভিনয় করব না।'

পুষ্প লীনার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কী রকম বিশ্রী ভঙ্গিতে লোকটা বলল—কিছুই তো হল না। কিছুই না হওয়াটা যেন তার অপরাধ।

পুষ্পের ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। রাত এখনো তেমন হয় নি। সে একটা রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারবে। তার এত ভয় টয় নেই। তবে ইচ্ছা করলেই তো আর যাওয়া যায় না। মীনা আপা তাকে নিয়ে এসেছেন। ফিরতে হবে মীনা আপার সঙ্গেই। মীনা আপার কাণ্ড কারখানাও অদ্ভুত। তাকে নিয়ে আসার পর আর কোনো খোঁজখবর নেই। ফর্সা মতো একটা লোকের পাশে বসে ক্রমাগত কথা বলছে। ফর্সা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এইসব কথা মন দিয়ে শুনছে। বরং মনে হচ্ছে ফর্সা লোকটা বিরক্ত হচ্ছে।

মীনা আপা পুষ্পদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। কৃষি ব্যাংকে কাজ করেন আর নাটক থিয়েটার করেন। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। এখনো বিয়ে হয় নি। পুষ্পের ধারণা

বিয়ে হবার সম্ভাবনা খুব কম। মীনা আপা বছর তিন আগে থেকে মোটা হতে শুরু করেছেন। এখন প্রায় মৈনাক পর্বত। থুতনিতে ভাঁজ পড়েছে। হাঁটার সময় থপ থপ শব্দ হয়।

মীনা আপার ধারণা টনসিল অপারেশনের জন্যে তাঁর এটা হয়েছে। টনসিল অপারেশন না হলে আগের মতো হালকা পাতলা থাকতেন। এই নাটকে মীনা আপা কিসের পার্ট করেন কে জানে?

আসিফ এসে ঢুকল ঠিক সাড়ে আটটায়। দরজা থেকেই লীনার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল। এই হাসির অনেকগুলো অর্থ। আট বছর পাশাপাশি থাকায় লীনা এখন সব ক'টি অর্থ ধরতে পারে। অর্থগুলো হচ্ছে—দেরির জন্যে আমি লজ্জিত, সারাদিনের পরিশ্রমে আমি খানিকটা ক্লান্ত এবং একটা খারাপ খবর আছে।

আসিফকে ঠিক সুপুরুষ বলা যাবে না। শক্ত সমর্থ গড়ন। মাথা ভর্তি অগোছালো কোঁকড়ানো চুল। চোখ দু'টি ছোট, ঠোঁট বেশ পুরু। চওড়া কাঁধ। সব কিছু মিলিয়েও আলাদা কিছু আকর্ষণ তার মধ্যে আছে।

লীনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। আট বছর এর সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানোর পরেও এই মানুষটাকে দেখলে তার মধ্যে তরল অনুভূতি হয়। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

আসিফকে ঢুকতে দেখেই বজলু সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে হুংকার দিলেন, 'স্টার্ট কর। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু হবে। আজ কোনো প্রম্পটিং হবে না। একেকবার ডায়লগ ভুলে গেলে পাঁচ টাকা করে জরিমানা। আসিফ যাও স্টেজে উঠে পড়। তোমার চেয়ার আর টেবিল দাও, বাঁ দিকে একটু পেছনে। দর্শকরা যেন শুধু সাইড ভিউ পায়।'

মিজান বলল, 'পেছনের চৌকির পশ্চিম দিকের কোণায় একটা ভাঙা আছে। খেয়াল রাখবেন কাইন্ডলি।'

আসিফ বলল, 'এক কাপ চা খেয়ে নিই বজলু ভাই। খুব টায়ার্ড ফিল করছি।'

'এক চুমুকে চা শেষ কর। কুইক। সাতদিন পর শো, অথচ এখনো একটা দিন ফুল রিহার্সেল দিতে পারলাম না।'

লীনা ভেবেছিল আসিফ চায়ের পেয়ালা হাতে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলবে। তা সে করল না। চায়ের কাপ হাতে প্রণবকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। আসিফ নিজের বাসার বাইরে এলে স্ত্রীর সঙ্গে কেমন যেন আলগা একটা ব্যবহার করে। যেন সে লজ্জা পায়।

পুষ্প বলল, 'চায়ের কাপ হাতে বারান্দার দিকে যে গেলেন, উনি কি এই নাটকের নায়ক?'

লীনা হেসে বলল, 'তার চেহারাটা কি তোমার কাছে নায়কের মতো মনে হল?

'না, তা না।'

'হ্যাঁ, এ-ই নায়ক। নাটকের শুরুটা বলি, তোমার ভালো লাগবে। একজন বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস থেকে নাটক করা। গল্পটা খুব চমৎকার। শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'এই নাটকের নায়ক হচ্ছেন একজন লেখক। নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর দিকে

তার যতটা সময় দেয়া দরকার ততটা দিতে পারছেন না। রাত দশটার পর উনি লেখার খাতা নিয়ে বসেন। স্ত্রী বেচারী একা একা শুয়ে থাকে। মেয়েটির বয়স খুব কম, এই ধর আঠার উনিশ। তার খুব ইচ্ছে করে স্বামীর সঙ্গে রাত জেগে গল্প করতে। স্বামী বেচারা তা বুঝতে পারে না। সে তার উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। ঘটনাটা শুরু হয়েছে এক রাতে। স্বামী লিখছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। লেখকের স্ত্রী একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বসার ঘরে ঢুকল।'

'লেখকের নাম কি?'

'পুরো নাটকে লেখকের কোনো নাম নেই। তাকে সব সময় লেখক বলা হয়েছে, তবে লেখকের স্ত্রীর নাম হচ্ছে জরী।'

'আপনি হচ্ছেন লেখকের স্ত্রী, তাই না?'

'হ্যাঁ। কী করে বুঝলে?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল।'

নাটক শুরু হল। স্টেজের এক প্রান্তে লেখার টেবিল। চেয়ারে পা তুলে আসিফ বসে আছে। বজলু সাহেব বললেন, 'চেয়ারে পা তুলে বসেছ কেন? এটা কী রকম বসা?'

আসিফ বলল, 'ঘরোয়া ভাবে বসেছি বজলু ভাই। খুব রিলাক্সড হয়ে বসা। পা নামিয়ে ঠিকঠাক মতো বসলে ফর্মাল একটা ভাব চলে আসে।'

'দেখতে ভালো লাগছে না। দেখতে ভালো লাগার একটা ব্যাপার আছে। দর্শক হিসাবে জিনিসটা দেখতে ভালো লাগতে হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি....'

বজলু সাহেব কথা শেষ করলেন না। আসিফ বলল, 'বজলু ভাই আমি চাচ্ছি যেন আমাকে ভালো না লাগে। লেখকের সব কাণ্ডকারখানায় তার স্ত্রী যেমন বিরক্ত—আমি চাই দর্শকরাও যেন ঠিক তেমনি ভাবে বিরক্ত হয়।'

বজলু সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'তুমি পা নামিয়ে বস।' আসিফ পা নামাল।

'বা হাতে মাথা হেলান দিয়ে লিখতে শুরু কর।'

পুষ্প মুগ্ধ হয়ে দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতোই ব্যাপার। একজন লেখক গভীর আগ্রহ নিয়ে লিখছেন এটা এত সুন্দর বোঝা যাচ্ছে! মাঝে মাঝে লেখা থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। লেখক একটা সিগারেট মুখে দিলেন। দেশলাই দিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে ধরালেন না। নতুন কিছু মাথায় এসেছে। দেশলাই ফেলে কলম তুলে নিয়ে আবার ঝড়ের বেগে লিখতে শুরু করেছেন—এমন সময় বাতি নিভে গেল। লেখক কী প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়েই না তাকাচ্ছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে। লেখকের প্রতি সহানুভূতিতে পুষ্পের চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল লেখকের স্ত্রী জরী আসছে। তার হাতে মোমবাতি। বাতাসের ঝাপ্টা থেকে বাতি আড়াল করে আসছে। তার মুখে কেমন যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। পুষ্প দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে। লেখক কথা বললেন। কি চমৎকার ভরাট গলা। স্বপ্ন মাখা স্বর।

লেখক : জরী তুমি এখনো জেগে আছ?

জরী : ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনি খাটের নিচে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। কে যেন আবার খুক খুক করে কাশল। পুরুষ মানুষের কাশি। ভয়ে আমি অস্থির। খাটের নিচে

কে যেন বসে আছে।

লেখক : আবার আজেবাজে কথা শুরু করেছ?

জরী : মোটেই কোনো আজেবাজে কথা না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের খাটের নিচে একটা ভূত থাকে। পুরুষ ভূত। ভূতটার গায়ে তামাকের গন্ধ।

লেখক : জরী, তুমি দয়া করে মোমবাতিটা এখানে রেখে ঘুমিয়ে পড়। প্লিজ, প্লিজ—এই দেখ হাতজোড় করছি।

জরী : ঝড়বৃষ্টির রাতে একা একা ঘুমুব? ভূতটা যদি আমাকে কিছু করে। ওর মতলবটা আমার কাছে বেশি ভালো মনে হচ্ছে না।

লেখক : তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছ না—লেখালেখিটা একটা মুডের ব্যাপার। মুড সব সময় আসে না।

জরী : এখন এসেছে?

লেখক : হ্যাঁ এসেছে। সারারাত আমি লিখব।

জরী : আর আমি সারারাত ঐ ভূতটার সঙ্গে ঘুমুব?

লেখক : আমি একটা ক্লাইমেক্সে এসে থেমে আছি। আমার নায়ক অভাবে অনটনে পর্যুদস্ত। বেকার, হাতে একটা পয়সা নেই। সকালবেলা খবর পেয়েছে তার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সে ঠিক করেছে আত্মহত্যা করবে..... ।

জরী : এখনো করে নি?

লেখক : না করে নি। তবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন পথে পথে ঘুরছে।

জরী : সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছে তাহলে আর দেরি করছ কেন? কোনো একটা ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। ঝামেলা চুকে যাক। আমরা আরাম করে ঘুমুতে যাই।

লেখক : বড্ড যন্ত্রণা করছ জরী।

জরী : আমি আর কত যন্ত্রণা করছি? তোমার নায়ক অনেক বেশি যন্ত্রণা করছে। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েও পথে পথে ঘুরছে। এত ঘোরার দরকার কিরে ব্যাটা? লাফ দিয়ে কোনো একটা ট্রাকের নিচে পড়ে যা। ঢাকা শহরে কি ট্রাকের অভাব?

লেখক : (কড়া স্বরে) জরী।

জরী : আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যদি চাও তো এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারি।

লেখক : এই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস চাই, তা হচ্ছে নীরবে কাজ করার স্বাধীনতা।

জরী : বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে এক কাপ চাও দিয়ে যাচ্ছি।

পুষ্প দেখল জরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর কাছ থেকে চলে আসছে। ঢুকেছে রান্নাঘরে। চা বানাচ্ছে। চা বানাতে বানাতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখে আঁচল দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল তারপর চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে ঢুকল।

বজলু সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'স্টপ।' অভিনয় থেমে গেল। বজলু সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই নাটক স্লো। এরকম একটা

স্লো নাটকে তার চেয়েও স্লো এ্যাকশান পাবলিক মোটেও একসেপ্ট করবে না। চা বানানোর জন্যে পাশের ঘরে যাওয়া মানেই নাটক স্লো করে দেয়া। জরী, তোমাকে লেখকের পাশেই থাকতে হবে। ঐ ঘরেই ফ্লাস্কে চা বানানো আছে। তুমি শুধু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দেবে।'

লীনা বলল, 'বজলু ভাই একটা সমস্যা আছে তো। ইমোশান বিল্ড আপ করার জন্যে আমার কিছু সময় দরকার। এই সময় তো আমি পাচ্ছি না।'

'যা করার এই সময়ের মধ্যেই করতে হবে।'

'এত অল্প সময়ে চোখে পানি আনতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'পারবে। অবশ্যই পারবে। না পারলেও ক্ষতি নেই। সাজেসানের উপর দিয়ে কেটে বের হয়ে যাবে। নাও শুরু কর। স্টার্ট। লেখকের পাশে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। শান্ত ভঙ্গিতে বলছ—বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে এককাপ চা দিয়ে যাচ্ছি। ওকে স্টার্ট। জরী, ডেলিভারি এত সফট দিও না। একটু হার্ড দিও।'

অভিনয় শুরু হল। লেখক একমনে লিখছেন। জরী ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে-ঢালতে লেখকের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। তার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। এক সময় টপ-টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। পুষ্প অবাক হয়ে দেখল কত সহজে মেয়েটির চোখে পানি এসে গেছে। এটা যেন অভিনয় নয়। বাস্তব জীবন। স্বামীসঙ্গ কাতর একটি মেয়ের অভিমানের অশ্রু। লেখক চোখ তুলে তাকালেন—এবং অবাক হয়ে বললেন—

লেখক : কী হয়েছে, চোখে পানি কেন?

জরী : (চোখ মুছতে-মুছতে) আমার খুব বাজে একটা চোখের অসুখ হয়েছে। রাত হলে চোখ কড় কড় করে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

লেখক : পল্টুকে একবার দেখাও না কেন?

এই বলেই লেখক আবার লিখতে শুরু করেছেন।

জরী চলে আসছে। দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। জরী তাকিয়ে আছে লেখকের দিকে। লেখক একমনে লিখছেন। জরীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পুষ্প বুঝতেও পারে নি যে তার চোখ দিয়েও পানি পড়তে শুরু করেছে। মেয়েটির কষ্টে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি চেঁচিয়ে লেখককে বলবে—পাষণ্ড কোথাকার। সে কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। তার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু সে চোখের পানি থামাতে পারছে না। আসিফ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

আসিফ বলল, 'তোমার নাম কি?'

পুষ্প ধরা গলায় বলল, 'আমার নাম দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই।'

এটা সে কেন বলল কে জানে? লেখকের উপর তার অসহ্য রাগ লাগছিল। এই রাগের জন্যেই হয়ত বলেছে। এখন আবার তার জন্যে খারাপ লাগছে।

হলঘরের ভেতর অসহ্য গরম।

বাইরে এসে একটু আরাম লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। লীনা হালকা গলায় বলল, 'বৃষ্টি হবে না কি?' আসিফ জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে অন্য কিছু ভাবছে।

লীনা বলল, 'কিছু ভাবছ নাকি?'

'না।'

'বড্ড পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলে কেমন হয়?'

'ভালোই হয়।'

তারা দু'জন কনফেকশনারি দোকানে ঢুকল। লীনার কী যেন একটা বলার কথা, অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাঝে-মাঝে তার এ রকম হয়। খুব জরুরি কথা, যেটা না বললেই নয়—অথচ মনে পড়ে না।

'লীনা।'

'কি?'

'টিভিতে একটা অফার পেয়েছি, যাব কি-না বুঝতে পারছি না।'

'যাবে না কেন?'

'কখনো করি নি তো। বুঝিও না। তাছাড়া—।'

'তাছাড়া কি?'

'রোলটা খুব ছোট। নায়কের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নায়কের কাছে দু'বার টাকা ধার চাইতে আসে। এই পর্যন্তই। অভিনয়ের কোনো স্কোপ নেই।'

'তা হলে যাবে কেন? তোমার মতো এত বড় অভিনেতা। তুমি যদি টিভিতে যাও সুপার স্টার হয়ে যাবে।'

আসিফ হাসল। লীনা বলল, 'আমি মোটেও হাসির কথা বলি নি। তুমি হচ্ছ সুপার-সুপার স্টার। তুমি নিজেও সেটা খুব ভালো করেই জান। জান না?'

আসিফ জবাব দিল না। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা বেশ উঁচু। সে খুব ভালো করেই জানে তার ক্ষমতা কতটুকু। তার আশেপাশে যারা আছে তারাও জানে। ক্ষমতা তেমন কাজে আসছে না। তাদের দলটা ছোট—অভিনেতা-অভিনেত্রী তেমন নেই। মঞ্চে যেদিন শো হয়, সেদিন অডিটরিয়াম প্রায় ফাঁকা থাকে। বড় কোনো দলে যদি সুযোগ পাওয়া যেত। তবে দলটির প্রতি তার মমতা আছে। এরা তার জন্যে অনেক করেছে। প্রথম বারেই প্রধান চরিত্র তারা তাকে দিয়েছে। অন্য কোনো দল তা করত না।

লীনা বলল, 'তুমি কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তা করছ বলে মনে হচ্ছে।'

'না তা করছি না। কোক শেষ হয়েছে? চল রওনা দিই। বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

লীনা বলল, 'কিছুক্ষণ হাঁটি, তারপর রিকশা নেব। হাঁটতে ভালো লাগছে।'

'বেশ তো চল হাঁটি।'

লীনা ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। সে আসিফের হাত ধরে আছে। রিহার্সেলের সময় খুব ক্লান্তি লাগছিল। এখন বেশ ভালো লাগছে। আসিফ ঘড়ি দেখল—রাত দশটা। আশপাশ কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছিনতাই পার্টির সামনে না পড়লেই হল।

লীনা বলল, 'তোমাকে কি একটা জরুরি কথা বলতে চাচ্ছিলাম, এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।'

'তাহলে বোধ হয় তেমন জরুরি নয়।'

'না, জরুরি। খুবই জরুরি। আমার মাথায় কী যেন হয়েছে বুঝলে—কিছু মনে থাকে না। ব্রেইন টিউমার-ফিউমার কিছু একটা হয়েছে।'

আসিফ তার জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। হাত ইশারা করে খালি রিকশা

ডাকল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আর হাঁটতে পারছি না, চল রিকশায় উঠি। তোমার জরুরি কথাটা মনে পড়েছে?'

'না। তুমি যখন আশেপাশে থাকবে না তখন হয়ত মনে পড়বে। আমি ঠিক করেছি মনে পড়লেই একটা কাগজে লিখে ফেলব। কাগজটা থাকবে আমার ব্যাগে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।'

রিকশা দ্রুত চলছে। হাওয়ায় লীনার শাড়ির আঁচল উড়ছে। লীনা শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে বলল, 'এক সময় আমরা একটা গাড়ি কিনব, বুঝলে। তারপর রোজ রাতে গাড়িতে করে ঘুরব। তুমি চালাবে। আমি তোমার পাশে থাকব।'

আসিফ জবাব দিল না। লীনা যখন কথা বলে তখন সে বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকে। বিয়ের প্রথম দিকে লীনার অসুবিধা হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আসিফ কথা না বললেও তার অসুবিধা হয় না।

'আজ রিহার্সেলে নতুন মেয়েটাকে দেখেছ? পুষ্প নাম।'

'হ্যাঁ দেখলাম। কথাও তো বললাম। অভিনয় না কি পারে না, বজলু ভাই বলছিলেন।'

'মেয়েটা অভিনয় দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।'

'হুঁ।'

'এই দেখে তোমার কোনো স্মৃতি মনে পড়ে নি?'

'কোন স্মৃতি?'

'একটু মনে করে দেখ।'

আসিফ তেমন কিছু মনে করতে পারল না। লীনার খানিকটা মন খারাপ হল। সে চাপা গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে ঠিক এইভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল। মনে আছে? ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে নাটক করছিলে। তুমি হলে মধু পাগলা। মনে আছে?'

'আছে।'

'তোমার ছেলে মরে গেছে, তার ডেডবডি নিয়ে তুমি যাচ্ছ। আপন মনে কথা বলছ। অভিনয় যে এত সুন্দর হতে পারে ঐদিন প্রথম বুঝলাম, কেঁদে-কেটে একটা কাণ্ড করেছি। শেষে বাবা আমাকে হলের বাইরে নিয়ে যান। তখনো আমি ফোঁপাচ্ছিলাম। তোমার কিছু মনে নেই, তাই না।'

'মনে থাকবে না কেন? মনে আছে—নাটকটা সুবিধার ছিল না। মেলোড্রামা। খুবই দুর্বল সংলাপ।'

রিকশা গলির মোড়ে থামল। জায়গাটা হচ্ছে শান্তিবাগ। গলির ভেতর তিন তলা বাড়ির দোতলায় তারা থাকে। একটাই ফ্ল্যাট। দু'টি পরিবার শেয়ার করে। কমন রান্নাঘর। তবে তাতে তেমন অসুবিধা হয় না।

বাড়ির গেটের কাছে এসে আসিফ থমকে দাঁড়াল। বিব্রত গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আর যাচ্ছি না। সকালে ফিরব।'

লীনা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে।'

'শেলীর এ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হবে রাত এগারটায়। থাকা দরকার। দুলাভাই চিটাগাং গেছেন। বড় আপা একা।'

'এতক্ষণ এটা আমাকে বল নি কেন?'

'এইতো বললাম।'

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার শরীর খারাপ—রেস্ট দরকার।'

'আমার শরীর খারাপ তোমাকে বলল কে?'

'কয়েক রাত ধরেই তো ঘুমুতে পারছ না। যতবারই উঠি, দেখি চুপচাপ বিছানায় বসে আছ।'

লীনা বলল, 'বেশ তো যাবে যাও—ভাত খেয়ে যাও।'

'ভাত খাব না। একদম খিদে নেই। সন্ধ্যাবেলা ভাজাভুজি কি সব খেয়েছি, টক ঢেকুর উঠছে। যাই লীনা।'

লীনা বেশ মন খারাপ করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। জরুরি কথাটা এখন তার মনে পড়েছে। চেঁচিয়ে ডাকবে আসিফকে? ডেকে বলবে জরুরি কথাটা? ডাকাটা কি ঠিক হবে? এখন মনে হচ্ছে কথাটা তেমন জরুরি নয়।

দোতলার ফ্ল্যাটটা লীনারা যাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকছে, তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন। স্বামী স্ত্রী এবং তিন বছর বয়েসী একটি মেয়ে। এক জন কাজের ছেলে আছে, সে বেশিরভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। পরিবারের কর্তা হাশমত আলি বেশ বয়স্ক লোক। চল্লিশের মতো বয়স। আগে একবার বিয়ে করেছিলেন। ঐ পক্ষের দু'টি মেয়ে আছে। মেয়েরা তাদের নানার বাড়িতে থাকে। নানার বাড়ি টঙ্গিতে। মাঝে-মাঝে আসে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলা চলে যায়। হাশমত সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বেনু। এই মেয়েটার বয়স খুবই কম। পনেরো ষোল হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রামের মেয়ে। তবে শহরের চাল-চলন দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলেছে। মেয়েটি সুন্দরী, তবে বাচ্চা হবার পর গাল-টাল ভেঙে গেছে। বাচ্চাটা মায়ের কোল ছাড়া থাকতেই পারে না। বেনুকে সারাদিন বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। লীনাকে সে খুবই পছন্দ করে। যতক্ষণ লীনা বাসায় থাকে বেনু তার পেছনে থাকে। ব্যাপারটা লীনার পছন্দ না হলেও কিছু বলে না। এই সাদাসিধা অল্প বয়েসী মেয়েটাকে লীনার ভালোই লাগে। সেই তুলনায় হাশমত আলিকে তার একেবারেই ভালো লাগে না। লোকটার সব কিছুই কেমন যেন গ্রাম্য। রেলের বাঁধা মাইনের চাকরিতেও তার রোজগার সন্দেহজনকভাবে ভালো। তবে তার ব্যবহার ভালো। গত মাসে সে একটা ফ্রিজ কিনেছে এবং লীনাকে বলেছে, 'কিছু এরিয়ার টাকা পেলাম, তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিলাম, তারপর কিনে ফেললাম। একটা শখ ছিল ভাবি।'

লীনা বলল, 'ভালো করেছেন।'

'এখন আরাম করে ঠাণ্ডা পানি খেতে পারবেন। হা হা হা। বেনু, ভাবীকে একটা পেপসি দাও।'

'এখন থাক।'

'না ভাবি খান। খেতে হবে। এটা ভাবি আপনি নিজের ফ্রিজ ভাববেন। রিকোয়েস্ট। বেনু শোন, নিচের একটা তাক ভাবির। খবরদার কিছু রাখবে না। যদি দেখি তোমার কিছু আছে তাহলে অসুবিধা আছে। জিনিসটা কেমন কিনলাম ভাবি? ভালো না?'

'খুব ভালো। খুব সুন্দর।'

'অনেকগুলো টাকা চলে গেল, তবু শখের একটা জিনিস, তাই না ভাবি?'

'তা তো বটেই।'

হাশমত আলির মধ্যেও এক ধরনের সরলতা আছে। এটা লীনার ভালো লাগে।

এরা সুখেই আছে। নিজেদের নিয়ে আনন্দে আছে। পৃথিবী সমাজ টমাজ এইসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসে এরা গভীর আনন্দ খুঁজে পায়। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাতে হাশমত আলি বড়-সড় একটা মাছ কিনে এনেছে। বেনু সেই মাছ কাটছে। হাশমত আলি উবু হয়ে তার সামনে বসে আছে। মাছটা কী রকম, সেই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

'পুকুরের মাছ, কী বল বেনু? রঙটা কেমন কালো দেখ না। শ্যাওলার নিচে থেকে কালো হয়ে গেছে। নদীর মাছ হলে লাল হত। তেলটা ঠিক আছে কিনা দেখ তো।'

'ঠিকই আছে।'

'তেল দিয়ে বড়া বানাতে পারবে। মাছের তেলের বড়া—তার স্বাদই অন্যরকম। দুটো বড় করে পিস কাট। ভেজে লীনা ভাবিদের দিয়ে এস।'

'ওরা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। সকালে দেব।'

'আরে না এখনই দাও। টাটকা জিনিসের একটা আলাদা ব্যাপার আছে।'

গভীর রাতে প্লেটে ভাজা মাছ নিয়ে হাশমত আলি নিজেই দরজা ধাক্কায়, 'ভাবি ঘুমিয়ে পড়লেন না কি? ও ভাবি, ভাবি।'

পরিষ্কার বোঝা যায় এই পরিবারটি লীনাদের বেশ পছন্দ করে। কেন করে সেও এক রহস্য। এতদিন একসঙ্গে আছে, এর মধ্যে একদিনও নাটক দেখার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। হাশমত আলি অবশ্যি প্রায়ই বলে, 'একদিন যাব। বুঝলেন ভাবি, আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আসব। মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। সারাক্ষণ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে। বাচ্চা নিয়ে কি যাওয়া যায় ভাবি? বেনুকে একদিন নিয়ে দেখাব। গ্রামের মেয়ে, কিছু তো এই জীবনে দেখে নি।'

সিঁড়ির বাতি বোধ হয় আবার চুরি হয়েছে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে হচ্ছে। একটা সিঁড়ি আছে ভাঙা। বাড়িওয়ালাকে কতবার বলা হয়েছে। এখনো কিছু করছে না।

দরজা খুলে দিল বেনু। অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে একা-একা আসলেন ভাবি!'

'না একা না। তোমার ভাই নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'ভাই আবার গেলেন কই?'

'তার এক ভাগ্নির অপারেশন।'

'ও আল্লা! কী হইছে?'

কী হয়েছে লীনা নিজেও ভালোমতো জানে না। জানা উচিত ছিল। কথাবার্তা শুনে হাশমত বেরিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, 'একটা ভিসিপি ভাড়া করে নিয়ে এসেছি ভাবি।'

'তাই নাকি?'

'তিন শ' টাকা দিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করলাম। মনের শখ মিটিয়ে ছবি দেখব।'

'ভালোই তো।'

'খাওয়া দাওয়া করে আসেন। এক সঙ্গে দেখি—এগারটা ছবি এনেছি। সব ভালো-ভালো ছবি। আসিফ ভাই কই?'

'ওর এক ভাগ্নিকে দেখতে গেছে। ভোরবেলা আসবে।'

'আমি ভাবি দু'দিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছি। ক্যাজুয়েল লিভ। দিনরাত ছবি দেখব।'

'ভালো। দেখুন।'

'আপনি ভাত খেয়ে আসুন। একা একা ছবি দেখে সুখ নেই ভাবি।'

প্লেটে ভাত নিয়ে লীনা শোবার ঘরে চলে এসেছে। লীনার পেছনে পেছনে ঢুকেছে বেনু। ভাত খাওয়া হলে জোর করে তাকে ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে। লীনার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে তাকে ছবি দেখতেই হবে।

'ভাবি?'

'কী বেনু।'

'আপনি এত কাজ সারাদিনে ক্যামনে করেন তাই ভাবি। দিনে স্কুল। রাতে নাটক, থিয়েটার।'

'তুমিও তো অনেক কাজ কর। ঘরের সব কাজ সামলাও, বাচ্চা দেখ। বাচ্চা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'জ্বি। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াইছি। এরে একটা তাবিজ-টাবিজ দিতে হইব ভাবি।

'তুমি কোলে নিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করেছ বেনু।'

'তাও ঠিক।'

বেনু তৃপ্তির হাসি হাসল। যেন সে মেয়েকে নষ্ট করায় খুব আনন্দিত। সব মায়েরা যা পারে না সে তা পেরেছে।

'ভাবি।'

'বল।'

বেনু ইতস্তত করে বলল, 'একটা শরমের কথা ভাবি। খুকির আব্বা কেমুন একটা ছবি আনছে। অসভ্য কাণ্ডকারখানা। দেখলে শইল ঝিম ঝিম করে।'

'না দেখলেই হয়।'

'আমি খুকির আব্বারে বলছি—এই ছবি দেখলে পাপ হইব। সে খালি হাসে। এইসব ক্যামনে বানায় আফা?'

'জানি না বেনু।'

লীনাকে ছবি দেখার জন্যে বসতে হল। দিদার নামের কি একটা পুরনো সিনেমা হচ্ছে। হিন্দী প্রতিটি বাক্য হাশমত আলি অনুবাদ করে দিচ্ছে। খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রচণ্ড ঘুমে শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ছবি মাঝপথে রেখে লীনা উঠে এল। আর আশ্চর্য, বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম উধাও। লীনা অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল। মাথায় পানি দিয়ে এল, লাভ হল না। এই রাতটাও সম্ভবত অঘুমে কাটাতে হবে। এ রকম হচ্ছে কেন? তার মনে কি কোনো গোপন দুঃখ আছে? কোনো হতাশা আছে? থাকার তো কথা নয়। তাহলে এ রকম

হচ্ছে কেন?

বাবার অভিশাপ লাগল নাকি?

লীনার বাবা ডিস্ট্রিক্ট জাজ ওয়াদুদুর রহমান সত্যি-সত্যি মেয়েকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। জাজ শ্রেণীর মানুষরা কখনো খুব বেশি রাগতে পারেন না। কিন্তু তিনি রেগে গিয়েছিলেন। রাগে অন্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'কী আছে ঐ ছেলের? অভিনয় করে। অভিনয়টা আবার কি? অভিনয় হচ্ছে অনুকরণ। একটা বানরও অনুকরণ করে। তাই বলে একটা বানরকে বিয়ে করা যায়?'

লীনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এসব তুমি কী বলছ বাবা?'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি। ঐ ছেলের আর আছে কী? ঘাড়ে-গর্দানে এক ছেলে। থার্ড ক্লাস পেয়েছে বি. এ- তে। ব্যাংকে চাকরি করে। ঐ চাকরির বেতন কত তুই জানিস? এগার শ' টাকা। এগার শ' টাকা দিয়ে ও নিজে খাবে, না তোকে খাওয়াবে? না কি না খেয়ে থাকবে আর অভিনয় করে দেখাবে যে খুব খাওয়া হল?'

'ছিঃ বাবা, এই ভাবে কথা বল না।'

'আমার যা বলার আমি বললাম। এখন তোর যা ইচ্ছা করবি। তোর স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। তবে এই বাড়িতে বিয়ে হবে না। বিয়ের খরচ আমি দেব। সেই টাকা আলাদা করা।'

'তোমার টাকা আমার লাগবে না বাবা।'

'নাটকের লোক বিয়ে করার আগেই নাটকের সংলাপ শুরু করেছিস। জীবন নাটক না, এটা হাড়ে হাড়ে টের পাবি। জীবন এক সময় অসহ্য বোধ হবে।'

'অভিশাপ দিচ্ছ?'

'সত্যি কথা বলছি। মাঝে-মাঝে সত্যি কথা অভিশাপের মতো মনে হয়।'

লীনার বিয়ে হল বড় খালার বাড়িতে। সেই বিয়েতে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব এলেন না। তবে লীনার ধারণা তার বাবার অভিশাপ লাগে নি। তারা সুখী। প্রচণ্ড সুখী। টাকা পয়সার কষ্ট তো আছেই। এই কষ্ট তেমন কোনো কষ্ট নয়। সহনীয় কষ্ট। অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে ভালবাসার অভাবের কষ্ট। সে কষ্ট লীনাদের হয় নি। লীনা এখনো তার স্বামীর প্রতি তীব্র ভালবাসা বোধ করে। ভালবাসা কখনো একপক্ষীয় হয় না। আসিফও নিশ্চয়ই তার প্রতি সমপরিমাণ ভালবাসা লালন করে। কিন্তু সত্যি কি করে?

লীনা উঠে পড়ল। আবার মাথায় কিছু পানি দিল। পাশের ঘরে ভিসিপি চলছে। যুগল সংগীত। সুর বেশ সুন্দর। কথাগুলোর মানে কি কে জানে— ও মেরা পানছেরি।

পানছেরি শব্দের মানে কি? হাশমত সাহেবকে কাল একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। মনে থাকলে হয়। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

বেনুর বাচ্চা জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যা-ট্যা করে। বেনু তাকে নিয়ে বারান্দায় হাঁটছে আর বলছে, 'ও খুকি কান্দে না। ও খুকি কান্দে না।'

কি বিশ্রী নাম—খুকি। এর পর যদি ছেলে হয় হয়ত নাম রাখবে—খোকা।

লীনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তাদের প্রথম মেয়ের নাম সে রেখেছিল লোপামুদ্রা, পরের মেয়েটির নাম ত্রপা। ওরা কোথায় গেল? মৃত্যুর পর শিশুরা কোথায় যায়? সেই

দেশে একা একা ওরা কী করে? বাবা মার জন্যে অপেক্ষা করে কি? একদিন লীনা যখন যাবে ওরা কি তখন সেই ছোটটিই থাকবে না বড় হয়ে যাবে? যদি ছোট থাকে তাহলে কি চিনতে পারবে তাদের মাকে? মা মা বলে ছুটে আসবে তার দিকে? যদি ছুটে আসে তাহলে কাকে সে প্রথমে কোলে নেবে? লোপাকে না ত্রপাকে?

লীনার বুক জ্বালা করছে। সে দরজা খুলে বারান্দায় এল। বেনু বলল 'ঘুমান নাই আফা?'

'না।'

'দেখেন না কি বিরক্ত করে। ইচ্ছা করতাছে একটা আছাড় দেই।'

'ছিঃ এসব কী কথা। দেখি আমার কাছে দাও তো।'

বেনু তার মেয়েকে লীনার কাছে দিল। মেয়েটির কান্না থামল না। লীনা বলল, 'গরম লাগছে বোধ হয়, জামাটা খুলে দেব?'

'দেন।'

'মেয়ের তো খুব ঘামাচি হয়েছে। আমার ঘর থেকে পাউডার নিয়ে এস তো বেনু, পাউডার দিয়ে দিই।'

গায়ে পাউডার দেয়াতে হয়ত একটু আরাম হয়েছে। খুকি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম। মেয়েটা দেখতে সুন্দর হয় নি। বাবার মতো ভোঁতা ধরনের চেহারা। দাঁতগুলোও সম্ভবত উঁচু—তবু কী সুন্দরই না লাগছে। মানব শিশুর মতো সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছুই বোধ হয় নেই।

লীনার খুব ইচ্ছে করছে বলে—বেনু, তোমার মেয়ে আজ থাকুক আমার এখানে। তা সে বলতে পারল না। সহজ গলায় খুব সাধারণভাবে যা বলল তা হচ্ছে, 'নিয়ে যাও বেনু, ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বেনু তার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। লীনা ঠিক আগের ভঙ্গিতে খাটের উপর বসে আছে। পানি খেতে পারলে ভালো হত। বুক শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না।

পাশের ঘরে এখনো ভিসিপি চলছে। এরা কি সত্যি-সত্যি সারা রাত ছবি দেখবে নাকি! হাশমত আর বেনু দু'জনেই খুব হাসছে। এ রকম হাসাহাসির মধ্যে বাচ্চা ঘুমুবে কী করে? এই সহজ জিনিসটা বোঝে না কেন?

লীনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার লোপার কথা মনে পড়ছে। কেমন থপ থপ করে হাঁটত। চলন্ত কোনো পোকা টোকা দেখলেই খপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলত। সেই মুখ তখন কিছুতেই হাঁ করান যেত না। যেন পৃথিবীর সবচে লোভনীয় খাবারটি তার মুখে। এক বছর বয়সে কত কথা শিখে গেল—। কিছু কিছু কথার আবার কোনো অর্থই নেই। যেমন, ইরি কিরি মিরি মিরি।

লীনা বলত, 'এসব কোন পৃথিবীর ভাষা মা?'

লোপা তাতে আরো মজা পেত। হাত নেড়ে নেড়ে আরো অনেক উৎসাহ নিয়ে বলত, 'ইরি কিরি মিরি মিরি।'

লীনার চোখ জ্বালা করছে। সে বিছানায় উঠে বসল। কী করা যায়? কী করলে এই মেয়েটার কথা ভুলে থাকা যায়? লোপা ত্রপা এদের কথা সে কিছুতেই মনে করতে চায় না। কিছুতেই না।

পাশের ঘরে খুকি কাঁদছে। বেনুর বিরক্ত গলা শোনা যাচ্ছে। লীনা কি উঠে গিয়ে ওদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, 'বেনু, ওকে আমার কাছে দিয়ে যাও।'

নাকি চুপচাপ বিছানায় বসে থাকবে।

২

একা একা বসে থাকতে আসিফের কখনো খারাপ লাগে না।

আজ লাগছে। সোফাটায় কোনো ঝামেলা আছে কি না কে জানে। কোনোভাবে বসেই আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে—খাওয়া যাচ্ছে না। সাইন বোর্ড ঝুলছে—'ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।' চোখের সামনে এ রকম কড়া একটা সাইন বোর্ড নিয়ে সিগারেট ধরান যায় না। তা ছাড়া ঘরে ফিনাইলের গন্ধ। এই গন্ধ নাকে এলেই কেমন যেন নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।

আসিফ ঘড়ি দেখল, বারটা দশ। যে অপারেশন এগারটায় হবার কথা সেটা এখন হবে রাত একটায়। এনেসথেসিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নাকি কোন বিয়ে বাড়িতে গেছেন, বলে গেছেন বারটার দিকে ফিরবেন। সেইভাবেই ব্যবস্থা হয়েছে। আসিফের বড় বোন রেহানা খুব ছটফট করছেন। একবার তিন তলায় যাচ্ছেন আবার আসছেন এক তলায়। এই ক্লিনিকটা বেশ ভালো। লিফট আছে। মাঝরাতেও লিফটম্যান আছে। রেহানা লিফটে উঠছেন না। সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা-নামা করছেন। রেহানার শরীর বিশাল, কিন্তু তাতেও তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। শুধু মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে এবং তিনি খুব ঘামছেন।

আসিফ বলল, 'তুমি শান্ত হয়ে বস তো আপা। এ রকম করছ কেন?'

'এনেসথেসিস্টতো এখনও এল না। অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব?'

'এসে পড়বেন। তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ। বস আমার পাশে। তোমার নিজের হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।'

রেহানা বসলেন না। ছটফটিয়ে আবার তিন তলায় রওনা হলেন। তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই এনেসথেসিস্ট এসে পড়ল। এক ধরনের টেনশান আসিফের মধ্যেও ছিল। এখন আর তা নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, সোফায় বসতেও তার আরাম লাগতে শুরু করেছে। ঘুম ঘুমও পাচ্ছে। এ ভাবে বসে থাকলে ঘুম এসে যেতে পারে। আসিফ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে, ধরান যাচ্ছে না। চারদিকে আত্মীয়স্বজন। ঢাকা শহরে যেখানে যে ছিল সবাই চলে এসেছে। ক্লিনিকের সামনে ছ'সাতটা গাড়ি।

আসিফদের পাঁচ বোনের চার জনই থাকে ঢাকাতে। তারা সবাই এসেছে। তাদের আত্মীয়স্বজনরা এসেছে। হুলুস্থুল ব্যাপার। এদের প্রায় কাউকেই সে ভালোমতো চেনে না। কয়েকবার হয়ত দেখা হয়েছে, 'কি কেমন? ভালো?'—এই জাতীয় কথাবার্তা হয়েছে। এর বেশি কিছু না। বোনদের স্বামীর বাড়ির লোকজনদের সে যেমন চেনে না, ওরাও চেনে না। তবু কয়েকজন চকচকে চেহারার মানুষ আসিফকে বলল, 'কি,

ভালো?'

আসিফ খুবই পরিচিত ভঙ্গিতে হেসেছে। কথাবার্তা পর্ব এই পর্যন্তই।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে গার্লস হাইস্কুলের একজন দরিদ্র এ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার তাঁর পাঁচ মেয়েকেই খুব ভালো বিয়ে দিয়েছেন, অথচ মেয়েগুলো পড়াশোনা বা দেখতে শুনতে এমন কিছু না। আসিফ তার বাবা মার পাঁচ কন্যার পরের সন্তান। শুধুমাত্র এই কারণেই যতটুকু আদর তার পাওয়া উচিত ছিল তার শতাংশও সে পায় নি। আসিফের বাবা সিরাজুদ্দিন সাহেব তাঁর সর্বশেষ সন্তানকে কঠিন হাতে মানুষ করতে শুরু করলেন। তাঁর এই ছেলে যে হীরের টুকরো ছেলে এটা তিনি সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান। অন্য বাচ্চারা যখন এক দুই শিখছে, তখন তাঁর ছেলে শিখছে তিনের ঘরের নামতা। ক্লাশ টুতে উঠেই সে রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা গোটাটা মুখস্থ বলে লোকজনদের চমকে দিতে শিখে গেল। সিরাজুদ্দিন সাহেবও পুত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ। বাড়িতে কেউ এলে আসিফকে তার প্রতিভার পরীক্ষা দিতে হয়। বীরপুরুষ কবিতা মুখস্থ বলবার পর সিরাজুদ্দিন সাহেব নিজেই বলেন, 'আচ্ছা বাবা, তিন আঠার কত বল তো?'

আসিফ গম্ভীর গলায় বলে, 'চুয়ান্ন।' অতিথি চমকে উঠে বলেন, 'আঠারোর ঘরের নামতা জানে না কি!' সিরাজুদ্দিন সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'ইংরেজি জিজ্ঞেস করেন। বানান জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা বাবা, জিরাফ বানানটা কি বল তো?'

আসিফ বানান বলে। অতিথি যত না চমৎকৃত হন, বাবা হন তারচে বেশি। গম্ভীর গলায় বলেন, 'সবই হচ্ছে ট্রেনিং। যত্ন নিতে হয়। প্রপার গাইডেন্স দরকার।'

ক্লাস এইট পর্যন্ত আসিফ প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। তারপর একদিন খুবই স্বাভাবিক গলায় বাবাকে এসে বলল, 'আমি আর পড়াশোনা করব না বাবা।' সিরাজুদ্দিন সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, 'সে কী!'

আসিফ সহজ স্বরে বলল, 'আমার ভালো লাগে না বাবা।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'আজ আর কাল এই দু'দিন পড়তে হবে না। বিশ্রাম কর। মাঝে–মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।'

'বিশ্রাম না বাবা। আমি আর পড়াশোনাই করব না।'

'টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা।'

'কান ছিঁড়ে ফেললেও পড়ব না।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তখন তাঁর তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। বাড়ি ভর্তি মেহমান। কিছু বলা বা শাসন করার মতো মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। আসিফের মা চিররুগ্না মহিলা। সংসারের কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। তবু তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'বাদ দাও। কয়েকটা দিন যাক। ছেলে মানুষ। বয়সটা দেখবে না?'

সিরাজুদ্দিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন—আসিফ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। সকালবেলা বের হয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। স্টার ড্রামাটিক ক্লাবে নাটকেও নাকি নাম দিয়েছে। রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত রিহার্সেল হয়। রিহার্সেল শেষ করে সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাড়ি ফেরে। সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে

থাকেন আর হতভম্ব হয়ে ভাবেন এসব কী হচ্ছে? হচ্ছেটা কী?

স্টার ড্রামাটিক ক্লাবের এ্যানুয়েল নাটক হল জেলা স্কুলের মাঠে। বিরাট হৈ-চৈ। সিরাজুদ্দিন সাহেব নাটক দেখতে গেলেন। ত্রিপুরা রাজপরিবার নিয়ে জমকালো নাটক। তিন রাজকুমারের গল্প। বড় রাজকুমার, মধ্যম রাজকুমার এবং ছোট রাজকুমার। বড় এবং ছোট রাজকুমারের অত্যাচারে মধ্যম রাজকুমার জর্জরিত। একদিন তার দু'চোখ নষ্ট করে দিয়ে দুই ভাই তাকে গভীর বনে ফেলে দিয়ে এল। ক্লান্ত শ্রান্ত মধ্যম রাজকুমার যে দিকে যেতে চায় গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। কোনোমতে উঠে দাঁড়ায়, আবার ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও—কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।

মধ্যম রাজকুমারের অভিনয় দেখে সিরাজুদ্দিন সাহেব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়তে লাগল। বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল। চারদিকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে তাঁর কানে বাজছে মধ্যম কুমারের হাহাকার—'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।'

গলায় একটা রূপার মেডেল ঝুলিয়ে আসিফ বাড়ি ফিরল। সিরাজুদ্দিন সাহেব আগেই পৌঁছেছেন। একা একা অন্ধকার বারান্দায় জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন। আসিফ ঘরে ঢুকতেই তাঁর আচ্ছন্ন ভাব দূর হল। শান্ত গলায় বললেন, 'আয় আমার সাথে।'

ছেলেকে তিনি বাসার পেছনের কুয়োতলায় নিয়ে গেলেন। সহজ গলায় বললেন, 'গলার মেডেলটা খুলে কুয়ার মধ্যে ফেল।'

তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আসিফ কোনো কথা না বলে মেডেল ফেলে দিল। গহীন কুয়া। মনে হল যেন দীর্ঘ সময় পর পানিতে ঝপ করে শব্দ হল।

সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এখন বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। বল, বল হারামজাদা।'

আসিফ কিছু বলল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। নয়ত তোকে আজ খুন করে ফেলব। বল, হারামজাদা। বল।'

আসিফ ক্ষীণ গলায় বলল, 'কেন বাবা?'

'বল তুই। বল। নয়ত খুন করে ফেলব।'

সিরাজুদ্দিন সাহেবের চোখে-মুখে উন্মাদ ভঙ্গি। তিনি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দু'হাতে চুলের মুঠি ধরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বল আর অভিনয় করব না। বল।'

আসিফ যন্ত্রের মতো বলল, 'আর অভিনয় করব না।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের মাথা কুয়ার মুখের কাছে ধরলেন। হিস হিস করে বললেন, 'বল, আবার বল। তিন বার বল।'

আসিফ বলল। গহীন কুয়া সেই শব্দ ফেরত পাঠাল। কুয়ার তল থেকে গমগমে অথচ শীতল একটি স্বর ফিরে এল। 'আমি অভিনয় করব না... অভিনয় করব না...

করব না।'

আসিফ তার কথা রেখেছিল। বাবা জীবিত থাকাকালীন সময়ে সে অভিনয় করে নি। তার জীবনের দ্বিতীয় অভিনয় সে করে বাবার মৃত্যুর এক বছর পর। গ্রাম্য কবিয়ালের একটা ভূমিকা। যে কথায় কথায় পদ বাঁধে। সেই পদ লোকজনদের বলে বলে শোনায় এবং গভীর আগ্রহে বলে, 'পদটা কেমন হইছে ভাইজান এট্টু কন দেহি। বুকের মইধ্যে গিয়া ধরে, ঠিক না? আহারে কী পদ বানছি—'

হলুদ পাখি সোনার বরণ কালা তাহার চউখ,
ছোট্ট একটা পাখির ভিতরে কত্ত বড় দুখ
ও আমার সোনা পাখিরে। ও আমার ময়না পাখিরে।

গ্রাম্য গীতিকারের অভিনয় করে সে ময়মনসিংহ শহরে একটা হৈ-চৈ ফেলে দিল। অভিনয়ের শেষে স্টেজের পেছনে গ্লাসে করে চা খাচ্ছে, জেলা স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে বললেন, 'আসিফ একটু বাইরে আস তো, ডিসট্রিক জাজ ওয়াদুদুর রহমান সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'চা-টা শেষ করে আসি স্যার।'

'চা পরে খাবে—আস তো তুমি।'

আসিফ বাইরে এসে দেখে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব হাতে চুরুট নিয়ে বিমর্ষ ভঙ্গিতে টানছেন। তাঁর গা ঘেঁষে লম্বা রোগামতন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখে দীঘির শীতল জলের মতো ঠাণ্ডা একটা ভাব। মেয়েটি কিছু বলল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'ইয়াং ম্যান, তোমার অভিনয় দেখে আমার মেয়ে খুব ইমপ্রেসড। ওয়েল ডান।'

আসিফ কী বলবে বুঝতে পারল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'আমার মেয়ের খুব ইচ্ছা তুমি একদিন আমাদের বাসায় এসে লাঞ্চ বা ডিনার কর। আমি নিজেও খুশি হব।'

'জ্বি আচ্ছা, আমি যাব।'

'ভেরি গুড। ইয়াং ম্যান, পরে একদিন দেখা হবে, কেমন?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা বলল, 'আপনি আজই চলুন না। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। প্লিজ।'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'বেচারা অভিনয় করে ক্লান্ত হয়ে আছে। আজ থাক। কোনো একটা ছুটির দিনে বরং....।'

'না বাবা আজ। ভালো লাগাটা থাকতে থাকতে ওকে বাসায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। আপনার কি খুব অসুবিধা হবে? প্লিজ আসুন না, প্লিজ।'

আসিফ গেল। ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ভাত খেল।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন—বাবা কী করেন? ভাই বোন কজন? বোনদের কোথায় বিয়ে হয়েছে? সে

া পড়ছে? ম্যাট্রিক রেজাল্ট কী? আই. এ তে কী রেজাল্ট?

লীনা এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুপ কর তো মা। কি শুধু উকিলের মতো প্রশ্ন করছ। ওকে ভাত খেতে দাও।'

মা চুপ করলেন না। প্রশ্ন করা ছাড়াও তাঁর পরিবারের সমস্ত তথ্য দিয়ে দিলেন। তার তিন মেয়ে এক ছেলে। ছেলে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পড়ছে নিউ জার্সি স্টেট কলেজে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। জামাই ডাক্তার। সম্প্রতি এফ আর সি এস করেছে। এখন আছে পিজিতে। লীনা দ্বিতীয় মেয়ে। ম্যাট্রিকে চারটা লেটার এবং স্টার মার্ক নিয়ে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফথ হয়েছে। আই. এ-তে খুব ভালো করতে পারে নি। সায়েন্স থেকে আর্টস-এ আসায় একটু অসুবিধা হয়েছে। তবু ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। এখন পড়ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। হলে থাকে। গরমের ছুটি কাটাতে এসেছে। ছোট মেয়েকে শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলেন। কলাভবনের ছাত্রী। তবে ওর সেখানে থাকতে ভালো লাগছে না। গরমের সময় খুব গরম পড়ে। মেয়ের আবার গরম সহ্য হয় না।

ফেরার পথে লীনা তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এল। নরম গলায় বলল, 'মা নিজেদের কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। আপনি আবার কিছু মনে করলেন নাতো?'

আসিফ বলল, 'না। কিছু মনে করি নি।'

'আমি আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি। সবার সামনে দিতে লজ্জা লাগল। আপনি যদি এটা নেন আমি খুব খুশি হব। আপনার অভিনয় আমার কী যে ভালো লেগেছে! অনেকদিন ধরেই আমার মনটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে এক ঝলক আলো পড়ল। খুব কাব্য করে কথা বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না, এই নিন।'

শাড়ির আঁচলের ভাঁজ থেকে লীনা কালো রঙের কী যেন বের করল। আসিফ বলল, 'এটা কি?'

'নটরাজের একটা মূর্তি। আমার ছোটবোন শান্তিনিকেতন থেকে আমার জন্যে এনেছিল। আমার খুব প্রিয়। আপনি নিন। আপনার টেবিলে সাজিয়ে রাখবেন। প্লিজ, প্লিজ।'

তখন আসিফের বয়স ছিল অল্প। হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ। রাতটাও ছিল অন্য রকম। চৈত্র মাসের রহস্যময় রাত। চারদিকে উথাল পাথাল চাঁদের আলো। পাশে নটরাজের মূর্তি হাতে দেবীর মতো এক তরুণী। তরুণীর কণ্ঠস্বর বড় স্নিগ্ধ। আসিফের চোখে জল এসে গেল। সেই জল গোপন করার কোনো চেষ্টা সে করল না। কেন যেন তার মনে হল, এই নারীর কাছে তার গোপন করার কিছুই নেই। এই নারী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

নটরাজের মূর্তি আসিফ নিজের কাছে রাখে নি। রূপার মেডেলের মতো মূর্তিটি সে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। কেন সে এটা করল? পৃথিবীর মতো, চৈত্র মাসের চাঁদের মতো, গহীন অরণ্যের মতো মানুষও রহস্যময়।

'ঘুমুচ্ছিস নাকি রে আসিফ?'

আসিফ চমকে উঠল। সে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। তার বেশ লজ্জা লাগছে। ভাগ্নির এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে, আর সে কি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। রেহানা

বললেন, 'অপারেশন হয়ে গেছে। পুতুল ভালো আছে। জ্ঞান ফিরেছে, কথা–টথা বলল।

'বাহ্‌, চমৎকার তো! তুমি এখন রেস্ট নাও আপা। খুব ধকল গেছে।'

রেহানা ক্লান্ত ভঙ্গিতে আসিফের পাশে বসল। ক্লিনিকের এই ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা। আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল সবাই চলে গেছে। আসিফের মেঝো বোন এখনো আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে ইনটেনসিভ কেয়ার ঘরটার পাশে। তারও চলে যাবার কথা। গাড়ি গিয়েছে একজনকে নামিয়ে দিতে। গাড়ি এলেই সেও চলে যাবে। এখানে থাকার আর কোনো মানে হয় না।

রেহানা বলল, 'আসিফ তুই কী করবি? থাকবি না চলে যাবি?'

'আমার অসুবিধা নেই, থাকতে পারি।'

'তোর খিদে লেগেছে বোধ হয়। রাতে তো খাস নি।'

'না খিদে লাগে নি।'

'তোর বউ কেমন আছে?'

'ভালোই।'

'অনেক দিন দেখি না। তোরা আসিস না কেন?'

'ব্যস্ত থাকি।'

'নাটক নিয়ে ব্যস্ত?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল—বউকেও নামিয়েছিস। এসব কী কাণ্ড বল তো। নিজে যা করছিস তাই যথেষ্ট, তার উপর যদি....।'

আসিফ কিছু বলল না। হাই তুলল। রেহানা বললেন, 'নাটক নাটক করে তোর লাভটা কী হয়েছে শুনি? এমন তো না যে দশটা লোক তোকে চেনে। তোর তো কিছুই হয় নি।'

'তা ঠিক।'

'এই জীবনে কোথাও স্থির হতে পারলি না। আজ এই চাকরি, কাল ঐ চাকরি। তোর বয়স হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

'বয়স হলে মানুষের একটা সিকিউরিটির দরকার হয়। একটা বাড়ি। কিছু টাকা পয়সা.... তোর আছে কি?'

'এইসব বাদ দাও।'

'বাদ দাও বললেই বাদ দেয়া যায়? এই যে পুতুলের অপারেশন হল—বার তের হাজার টাকা খরচ হয়েছে। টাকা ছিল বলে খরচ করতে পেরেছি। যদি না থাকত? তোর এই রকম কিছু হলে তুই কী করবি?'

'কী আর করব? হাসপাতাল যাব। বিনা পয়সার চিকিৎসার চেষ্টা করব।'

'তুই হয়ত ভাবিস তোকে নিয়ে আমরা চিন্তা–ভাবনা করি না। এটা ঠিক না। প্রায়ই আমাদের বোনদের মধ্যে আলোচনা হয়। খুবই কষ্ট লাগে।'

'কষ্ট লাগার কি আছে?'

'কষ্ট লাগার কিছু নেই? কী বলছিস তুই! একটা বাড়িতে থাকিস, সেই বাড়ির রান্নাঘর অন্য এক জনের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। এটা কেমন কথা?'

'সবার তো সব কিছু হয় না।'

'চেষ্টা করলে ঠিকই হয়। চেষ্টা না করলে হবে কীভাবে? কোনো রকম চেষ্টা নাই, বড় হবার ইচ্ছা নাই—নাটক, নাটক, নাটক।'

'এইসব বাদ দাও আপা, দেখি চা পাওয়া যায় কি না।' মাথা ভার-ভার লাগছে। চা খেলে ভালো লাগবে।'

'রাত দুপুরে চা পাবি কোথায়? চুপ করে বোস। তোর সঙ্গে দেখাই হয় না। সুযোগ পাওয়া গেল।'

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার সত্যি-সত্যি ঘুম পাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েও ঘুম তাড়ান যাচ্ছে না। রাত জাগার জন্যেই বোধ হয় প্রচণ্ড খিদেও লাগছে। খালি পেটে সিগারেট—নাভিতে পাক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে।

'আসিফ।'

'বল আপা।'

'তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো।'

'বেশিরভাগ সময়ই আমি সত্যি কথা বলি।'

'তোর কি এখন চাকরি নেই?'

'এই কথা বলছ কেন?'

'তুই তোর দুলাভাইকে বলেছিস তোর জন্যে একটা কিছু দেখে দিতে। এই থেকে অনুমান করছি। তোর কি চাকরি নেই?'

'না নেই।'

'ক'দিন ধরে নেই?'

'মাস দুই।'

'তোর বউ জানে?'

'জানবে না কেন? জানে।'

'তবু তুই নাটক করবি? এর পরেও তোর শিক্ষা হয় না? তুই কি মানুষ না জানোয়ার?'

রেহানা উঠে চলে গেলেন। আসিফ একা একা বসে রইল।

বেশিক্ষণ একা বসে থাকতে হল না। রেহানা আবার এসে ঢুকলেন। তিনি খুব কঠিন কিছু কথা বলতে এসেছিলেন—বলতে পারলেন না। আসিফের বসে থাকার ভঙ্গিটি দেখে তাঁর খুব মায়া লাগল।

৩

লীনা যে স্কুলে পড়ায় তার নাম—লিটল ফ্লাওয়ার্স। ইংরেজি স্কুল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। নানান কায়দা কানুন। সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা। মাসে একবার আউটিং।

আজ সেই আউটিংয়ের দিন। লীনাকে ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে হবে সাভার স্মৃতিসৌধে। একটা মাইক্রোবাস জোগাড় করা হয়েছে। লীনার সঙ্গে যাচ্ছে অতসী দি। গেম টিচার। মাইক্রোবাসে ওঠবার ঠিক আগ মুহূর্তে লীনা অতসীকে বলল,

'আমার না শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

অতসী বলল, 'যেতে চাও না?'

'না। শরীরটা খুবই খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে ফেইন্ট হয়ে যাব।'

অতসী বলল, 'তুমি কি কনসিভ করেছ নাকি?'

লীনা জবাব দিল না। এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না অথচ বিবাহিত মেয়েরা কত স্বাভাবিক ভাবেই না এসব নিয়ে আলাপ করে। লীনার মাঝে-মাঝে মনে হয়—তার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা আছে।

'তুমি এখন না গেলে বড় আপা খুব রাগ করবেন।'

'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

'তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। দাঁড়াও, আপার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

লীনা ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চাগুলো মাইক্রোবাসে উঠে বসে আছে। কোনো সাড়াশব্দ করছে না, যেন একদল রোবট। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে এদের রোবট বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। হুকুম ছাড়া এরা মুখ খুলবে না। এর কোনো মানে হয়। শিশুরা থাকবে শিশুদের মতো। হৈ-চৈ করবে, মারামারি করবে, কাঁদবে, হাসবে।

অতসী ফিরে এসে বলল, 'ব্যাপার সুবিধার না লীনা। বড় আপা খুব রেগে গেছে। তুমি যাও শুনে আস।'

প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন সত্যি-সত্যি রেগেছেন। লীনাকে ঢুকতে দেখে তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'বোস।' বলেই টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যালো, প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন বলছি....'

এইসব কেজি স্কুলগুলোর প্রধানরা বিচিত্র কারণে প্রিন্সিপ্যাল পদবী নেন। কেজি স্কুলগুলোতে কোনো হেডমিসট্রেস নেই। সব প্রিন্সিপ্যাল। এরা কথা-বার্তায় সত্তুর ভাগ ইংরেজি বলেন। অদ্ভুত ধরনের ইংরেজি।

'লীনা।'

'জ্বি আপা।'

'আপনি এসব কী শুরু করেছেন বলুন তো?'

'তেমন কিছু তো শুরু করি নি আপা। শরীরটা ভালো না, এটাই বলছি।'

'একটা এ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ হবার পর আপনারা বলবেন শরীর খারাপ, তাহলে কী করে হবে বলুন? আর এই শরীর খারাপ ব্যাপারটাও তো নতুন না। দুদিন পর-পর শুনছি শরীর খারাপ। এ ভাবে তো আপনি মাস্টারি করতে পারবেন না। আপনি বরং অন্য কোনো প্রফেসন খুঁজে বের করুন যেখানে তেমন কাজকর্ম নেই।'

লীনা উঠে দাঁড়াল।

জোবেদা আমিন ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'বাসায় চলে যাব। শরীরটা ভালো লাগছে না।'

জোবেদা আমিন কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। লীনার খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আপনি কি আপা কখনো লক্ষ করেছেন যে আপনার গোঁফ আছে? গায়ের রঙ কালো বলে তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ফর্সা হলে রোজ শেভ করতে হত।'

কথাটা বলা হল না। লীনা বাসায় চলে এল। বাসায় এসেই শরীর খারাপ ভাবটা কেন জানি কেটে গেল। সে বেনুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। খুকিকে গামলায় পানি

নিয়ে গোসল করিয়ে দিল।

দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙার পর মনে হল আসিফ থাকলে বেশ হত। দু'জন মিলে বিকেলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যেত। মিরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা বলধা গার্ডেন।

আসিফকে আজকাল কাছেই পাওয়া যায় না। বেচারা চাকরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে সারাদিন ঘোরে। কোথায় কোথায় ঘোরে, কার কাছে যায় কে জানে।

আজ অবশ্যি আসিফ চাকরির সন্ধানে ঘুরছিল না। সে চুপচাপ টেলিভিশন রিহার্সেল রুমে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ঋণপ্রার্থী লোকটির ক্ষুদ্র ভূমিকা নিতে সে রাজি হয়েছে। কৌতূহল থেকেই রাজি হয়েছে। দেখাই যাক না টিভি অভিনয় ব্যাপারটা কি? টেলিভিশন এখন অতি শক্তিশালী একটি মাধ্যম। একে উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই এসে গেছেন। আসিফ এদের কাউকে চিনতে পারছে না। তার ঘরে টিভি নেই। টিভি তারকারা তার কাছে অপরিচিত।

প্রযোজক এলেন পাঁচটার দিকে। মধ্যবয়স্ক এক জন ভদ্রলোক। হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। ঘরে ঢুকেই কি একটা রসিকতা করলেন। কেউ হাসল না। আসিফ কী করবে বুঝতে পারল না। এই ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে তাকে চিনতে পারছেন না। একবার চোখে চোখ পড়ল, তিনি চোখ সরিয়ে নিলেন।

সবাইকে স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসিফ কোনো স্ক্রিপ্ট পেল না। ছোট রোলের আর্টিস্টদের হয়ত স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় না। কিন্তু সংলাপগুলোতো জানতে হবে।

আসিফ উঠে দাঁড়াল; বেশ খানিকটা দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে গেল প্রযোজকের দিকে। প্রযোজক তাকে এইবার মনে হল চিনতে পারলেন। হাসিমুখে বললেন, 'ভেরি সরি ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে।'

আসিফ বলল, 'কি সমস্যা?'

'লাস্ট মোমেন্টে নাটকে কিছু কাট-ছাঁট করা হয়েছে। ষাট মিনিটের বেশি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই বাধ্য হয়ে—আপনি ভাই কিছু মনে করবেন না। নেক্সট নাটকে দেখব আপনাকে একটা রোল দেয়া যায় কি না।'

আসিফের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবার চোখে- মুখে সহানুভূতির ছায়া। আসিফ বলল, 'আমি তাহলে যাই?'

প্রযোজক বললেন, 'বসুন না, চা খেয়ে যান। একটা রিডিং হবার পরই চা আসবে।'

আসিফ নিজের জায়গায় এসে বসল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে চট করে চলে যাওয়া যেমন মুশকিল, আবার বসে থাকাও মুশকিল।

রিহার্সেল শুরু হয়েছে। রিহার্সেলের ধরনটা অদ্ভুত। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে রিডিং পড়ে যাচ্ছে। একেক জনের পড়া হয়ে যাওয়া মাত্র সে পাশের জনের সঙ্গে গল্প করছে। মনে হচ্ছে পুরো নাটকটার ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। নিজের অংশটা হয়ে গেলেই যেন দায়িত্ব শেষ।

একজন অভিনেতা পড়ার মাঝখানেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমিতো ভাই আর থাকতে পারছি না। জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট।' প্রযোজক তাঁকে রাখতে চেষ্টা করছেন। তিনি রাজি হচ্ছেন না।

আসিফ মনে মনে ভাবল—অতটা অনাগ্রহ নিয়ে এরা নাটক কেন করে? তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

৪

বজলু ভাই রাগী গলায় বললেন, 'এসব তুমি কী বলছ—লীনা আসবে না মানে? এর মানেটা কি?'

আসিফ বলল, 'লীনার শরীরটা ভালো না। ক'দিন ধরেই শরীর খারাপ যাচ্ছে।'

'কালই তো দেখলাম ভালো।'

'বাইরে থেকে ভালো মনে হয়েছে। আসলে ভালো না।'

'সবাই যদি এ রকম অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বসে থাকে তাহলে নাটক চলবে কী ভাবে? নাটক-ফাটক বন্ধ করে চল বাসায় চলে যাই।'

'প্রক্সি দিয়ে কোনো মতে চালিয়ে নিন।'

'প্রক্সি দিয়ে এইসব হয়? প্রত্যেকের তার নিজের রোল আছে, প্রক্সিটা দেবে কে? মুভমেন্ট সিনক্রোনাইজ করতে হবে না?'

'বজলু ভাই, আপনার সঙ্গে একটু আড়ালে কথা বলা দরকার। আসুন বাইরে যাই।'

'আমার সঙ্গে আবার আড়ালে কথা কি? ফিসফিসানি, গুজগুজানি এর মধ্যে আমি নেই। চল কোথায় যাবে।'

দু'জন রাস্তায় চলে এল। বজলু সিগারেট ধরালেন। তাঁর প্রেসার আছে। অল্পতেই প্রেসার বেড়ে যায়। সামান্যতম টেনশান সহ্য করতে পারেন না। এখন তাঁর টেনশান খুব বেড়েছে। আসিফ কী বলবে কে জানে।

'একটা সমস্যা হয়েছে বজলু ভাই।'

'কী সমস্যা?'

'লীনা অভিনয় করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কী বলছ তুমি এসব।'

'ওর শরীরটা খারাপ।'

'শরীর খারাপ, শরীর ঠিক হবে। চিরজীবন কারোর শরীর খারাপ থাকে? আজ রাতটা রেস্ট নিক। দরকার হলে আগামীকালও রেস্ট নেবে। আজ রিহার্সেলের পর আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।'

'ওর বাচ্চা হবে বজলু ভাই। আপনি তো ওর অবস্থাটা জানেন। এর আগে দুটো বাচ্চা মারা গেছে। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলো মরে যায়। ডাক্তাররা বলছে—পুরো রেস্টে থাকতে।'

'তুমি তো ভয়াবহ খবর দিলে আসিফ। আমার তো মনে হচ্ছে হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। শো পিছিয়ে দিতে হবে। এ তো মাথায় বাড়ি।'

'শো পেছানোর দরকার নেই। অন্য কাউকে এই রোলটা দিন। এটা তো খুব কমপ্লিকেটেড রোল নয়। যে কেউ পারবে।'

'এটা কি সাপ লুডু খেলা যে, যে কেউ পারবে। ফালতু কথা আমার সঙ্গে বলবে না তো। যে কেউ পারবে। যে কেউ পারলে তো কাজই হত।'

'ঐ দিন যে মেয়েটি এসেছিল—পুষ্প, ও পারবে, ওকে....'

'মাথাটা তোমার কি খারাপ হয়ে গেল নাকি? অভিনয়ের অ জানে না যে মেয়ে, গলা দিয়ে স্বর বের হয় না...।'

'আমি ওকে শিখিয়ে–পড়িয়ে ঠিক ঠাক করে দিতে পারব।'

'আমার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ—ছবি আঁকা, গান গাওয়া আর অভিনয়, এই তিন জিনিস শেখান যায় না—ভেতরে থাকতে হয়।'

'ঐ মেয়ের মধ্যে অভিনয় আছে। খুব সহজে মেয়েটা ইনভলভড হতে পারে। অভিনয় দেখতে দেখতে মেয়েটা কাঁদছিল।'

'অভিনয় দেখেই যে কেঁদে ফেলে, সে আবার অভিনয় করবে কি?'

'কে অভিনয় পারবে, কে পারবে না, এটা আমি বুঝি বজলু ভাই। লীনাকে আমি অভিনয়ে নিয়ে এসেছিলাম। লীনা কিন্তু আগে কোনোদিন করে নি।'

'মেয়েটা রাজি হবে কি না কে জানে। যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'এখনই চলে যাই—মীনাকে সাথে নিয়ে যাই। ওই প্রথম দিন মেয়েটিকে এনেছিল। তুমি বরং থার্ড সিন শুরু করে দাও।'

বজলু আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর টেনশান যেমন দ্রুত আসে তেমনি দ্রুতই চলে যায়। এখন টেনশান একেবারেই নেই।

'আসিফ, শো কি সময় মতো যাবে?'

'অবশ্যই যাবে।'

'টেনশান ফিল করছি।'

'টেনশানের কিছু নেই।'

'জাতীয় উৎসব, বড় বড় দল আসবে। কোলকাতা থেকেও নাকি দুটো টিম আসছে।'

'আসুক না।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলি আসিফ, নাটকটা আমার কাছে বেশি সুবিধার মনে হচ্ছে না। কোনো কনফ্লিক্ট নেই। রিলিফ নেই। ক্লাইমেক্স নেই।'

'জিনিস কিন্তু ভালো।'

'ভালোর তুমি কী দেখলে?'

'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন স্বপ্ন ব্যাপার আছে। কঠিন কিছু কথা খুব নরম করে বলা।'

'নরম করে বললে এই দেশে কিছু হয় না। শক্ত করে বলতে হয়। পাছায় লাথি দিতে হয়।'

'সবাই তো পাছায় লাথি দেয়া নাটক নিয়ে যাবে। আমরা না হয় একটা নরম নাটক নিয়ে যাই। নরম হলেও এটা খুব নামকরা নাটক বজলু ভাই। কবি এমিলি জোহানের কাব্যনাটক। বাংলায় ভাবানুবাদ করা। সত্যি করে বলুন তো আপনার ভালো লাগে না?'

'আর আমার ভালো লাগা। তোমাকে আরেকটা সত্যি কথা বলি আসিফ, আজ পর্যন্ত কাউকে বলি নি। তোমাকে বলছি—নাটক ভালো না মন্দ এটা আমি বুঝি না। আমি শুধু বুঝি—অভিনয় ঠিকমতো হচ্ছে কি না।'

'আপনি সবই বোঝেন। শুধু বোঝেন বললে কম বলা হবে, খুব ভালোই বোঝেন। দেখুন বজলু ভাই, আমি মানুষটা খুব অহংকারী, আমি অভিনয় ভালো করি। নিজে সেটা জানি—অভিনয়ের ব্যাপারে আমি কারোর কোনো উপদেশ শুনি না, কিন্তু আপনার কথা আমি শুনি। বজলু ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি চলে যান।'

রিহার্সেল শুরু হতে খানিকটা দেরি হল। প্রণব বাবুর বড় মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে, সেই উপলক্ষে তিনি প্রচুর খাবার-দাবার এনেছেন। হৈ-হৈ করে খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। গ্রুপের মেয়েরা কেউ নেই—সবাই বজলু সাহেবের সঙ্গে পুষ্প মেয়েটির কাছে গেছে। এই সুযোগে জলিল সাহেব আদিরসের দুটো গল্প বলে ফেললেন। দুটোর মধ্যে একটা হিট করল। কারোর হাসি আর থামতেই চাচ্ছে না। এই দলটিকে দেখলে কে বলবে এদের জীবনে কোনো দুঃখ-কষ্ট আছে? এদের দেখে মনে হচ্ছে গভীর আনন্দে এদের হৃদয় পরিপূর্ণ। রিহার্সেলের ঘরে এরা যখন ঢোকে জীবনের সমস্ত হতাশা ও বঞ্চনা পেছনে ফেলে ঢোকে। নাটক তাদের দ্বিতীয় জীবন। এই জীবনটাকেই তারা আঁকড়ে ধরে। দ্বিতীয় জীবনই এক এক সময় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় দৃশ্য শুরু হল। এটিও রাতের দৃশ্য। লেখক শোবার ঘরে। বিছানায় বসে আছেন। পাশেই তাঁর স্ত্রী—কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। লেখক লিখে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা শব্দ হল। লেখক চমকে তাকালেন—ঘরের মধ্যে কে যেন দাঁড়িয়ে। যে দাঁড়িয়ে, তার চেহারা ভালো না। সে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ। তার নাম ছলিমুদ্দিন। ছলিমুদ্দিনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রণব বাবু।

লেখক অবাক হয়ে ছলিমুদ্দিনকে দেখছেন। চিনতে পারছেন না। এই গভীর রাতে শোবার ঘরে লোকটা কোত্থেকে এল বুঝতে পারছেন না। তিনি খানিকটা ভীত।

লেখক : কে কে কে?

ছলিমুদ্দিন : আস্তে। চেঁচাবেন না। আপনার স্ত্রী জেগে উঠতে পারেন।

লেখক : কে কে? আপনি কে?

ছলিমুদ্দিন : চিনতে পারছেন না? কি অদ্ভুত কথা। নিজের সৃষ্টি করা চরিত্র নিজেই চিনতে পারছেন না। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, জীবন যুদ্ধে পরাজিত, ক্লান্ত শ্রান্ত একজন মানুষ, আজ সারাদিন যার খাওয়া হয় নি। যার প্রেমিকা অন্য এক পুরুষের হাত ধরে....

লেখক : ও আচ্ছা, আপনি ছলিমুদ্দিন!

ছলিমুদ্দিন : হ্যাঁ ছলিমুদ্দিন। আপনি আমার জন্যে একটা ভালো নাম পর্যন্ত খুঁজে পান নি। নাম দিয়েছেন ছলিমুদ্দিন। সুন্দর, শোভন, আনন্দদায়ক কিছুই আপনি আমার জন্যে রাখেন নি। একটি ভালো নাম কি আমার হতে পারত না?

লেখক : না, পারত না। আপনার জন্ম হয়েছে কৃষক পরিবারে। আপনার বাবা একজন বর্গাদার। সে তার পুত্রদের এ রকম নামই রাখবে। একজন কৃষক তার পুত্রের নাম নিশ্চয়ই আবরার চৌধুরী রাখবে না।

ছলিমুদ্দিন : আপনি ইচ্ছা করলে সবই সম্ভব। কলম আপনার হাতে। আপনি

ইচ্ছা করলেই কোর্টে এফিডেভিট করে আমার নাম পাল্টে আবরার চৌধুরী করতে পারেন। আপনি ইচ্ছা করলেই বিদেশি কোনো কোম্পানিতে আমার চমৎকার একটা চাকরি হতে পারে। ছলিমুদ্দিন নামটা যদি আপনার এতই প্রিয় হয়, বেশ তো আপনার ড্রাইভারের ঐ নাম দিয়ে দিন।

লেখক : তা সম্ভব নয়।

ছলিমুদ্দিন : কেন সম্ভব নয়? একের পর এক আপনার কারণে আমি জীবন যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছি। কেন আপনি এ রকম করছেন?

লেখক : এ রকম করছি কারণ, তোমার মাধ্যমে আমি সমাজকে তুলে আনছি। তুমি আলাদা কেউ নও। তুমি এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি। তোমাকে দেখে পাঠক চমকে উঠবে। ঘা খাবে।

ছলিমুদ্দিন : আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন? নিজের লেখা পড়ে দেখুন, বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়। এ জীবনে তো আপনি আমাকে কিছুই দেন নি। সামান্য সম্মানটুকু অন্তত দিন।

লেখক : আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করবেন। এখন থেকে আপনি করে বলব।

ছলিমুদ্দিন : ধন্যবাদ, আপনাকে যতটা হৃদয়হীন মনে করেছিলাম তত হৃদয়হীন আপনি নন। এটাই যখন করলেন তখন আরেকটু করুন। আমার প্রেমিকাকে আপনি ফিরিয়ে দিন। অর্থ বিত্ত, কিছুই চাই না। আমি পথে–পথে না খেয়ে ঘুরতে রাজি আছি। আপনি শুধু আমার প্রেমিকাকে ফেরত দিন।

লেখক : তা হয় না।

ছলিমুদ্দিন : অবশ্যই হয়। আপনি নিজে তো আপনার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আরাম করে বসে আছেন। আমি কেন বসব না? সমাজ দোষ করতে পারে, রাষ্ট্র দোষ করতে পারে—আমি তো কোনো দোষ করি নি। আমি কেন শাস্তি পাব?

লেখক : এই পচা সমাজে নির্দোষ যারা, তারাই শাস্তি পায়।

ছলিমুদ্দিন : সমাজ করুক। আপনি কেন করবেন? আপনি মানবপ্রেমিক এক জন লেখক। আপনি আমার প্রতি করুণা করুন। আপনি শেষের কুড়িটা পাতা ছিঁড়ে ফেলুন। আবার নতুন করে লিখুন। এর মধ্যে আমি আপনার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।

লেখক : আপনাকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, আপনি এ ঘর থেকে যান।

ছলিমুদ্দিন : না, আমি যাব না।

লেখক : যাবেন না মানে?

ছলিমুদ্দিন : মানে হচ্ছে, যাব না। প্রয়োজন হলে আপনাকে খুন করব।

লেখক : খুন করবেন!

ছলিমুদ্দিন : হ্যাঁ। অস্ত্র নিয়ে এসেছি—এই দেখুন। এগার ইঞ্চি ছোরা। এটা সোজা আপনার পেটে বসিয়ে দেব। আমি কেন আত্মহত্যা করব? আমার কি দায় পড়েছে?

লেখক : (ভয় পেয়ে) জরী, জরী, একটু ওঠ তো। এই জরী।

নাটক এক পর্যায়ে থেমে গেল। বজলু সাহেব ফিরে এসেছেন। পুষ্প তার সঙ্গে আছে। পুষ্পের চোখ মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। বজলু সাহেব অতিরিক্ত গম্ভীর। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'এই মজনু, চা দে।' আসিফ স্টেজ থেকে নেমে এল। বজলু

তাকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। তিক্ত গলায় বললেন, 'অপমানের চূড়ান্ত হয়েছি। শালার নাটক–ফাটক ছেড়ে দেব।'

আসিফ বলল, 'মেয়েকে তো নিয়েই এসেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

'ভেতরের ঘটনা জানলে এটা বলতে না। আমি নাটকের কথাটা বলতেই বাড়িতে আগুন ধরে গেল। সবাই এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি একজন মেয়ের দালাল। বুড়োমতো এক লোক, সম্ভবত মেয়ের চাচা–টাচা কিছু হবে, সরু গলায় বলছে, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।' রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি কি অভদ্রলোক নাকি?'

'রাজি করালেন কী ভাবে?'

'আমাকে কিছু করতে হয় নি, মেয়ে নিজেই উল্টে গেল। সে নাটক করবেই। কান্নাকাটি করে বিশ্রী এক কাণ্ড, এমন অবস্থা যে চলেও আসতে পারি না। বসেও থাকতে পারি না। ব্যাঙের সাপ গেলার মতো অবস্থা। এরকম সুপার ইমোশনাল মেয়ে নিয়ে কাজ করা যাবে না। শুধু শুধু পরিশ্রম।'

আসিফ বলল, 'আমি মেয়েটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। তারপর ছ' নম্বর দৃশ্যটা হোক। বাড়তি লোক চলে যেতে বলুন। মেয়েটা পারবে কী পারবে না আজই বোঝা যাবে।'

'তোমার মনে হয় পারবে?'

'হ্যাঁ পারবে। ভালোই পারবে।'

আসিফ পুষ্পকে বলল, 'এস আমরা ঐ কোণার দিকে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। গল্পগুজব করলে টেনশান কমবে। অভিনয় করা সহজ হবে।'

'আমার মধ্যে কোনো টেনশান নেই।'

'আছে। যথেষ্ট আছে। টেনশানের সময় মানুষ খুব উঁচু পর্দায় কথা বলে; তুমিও তাই বলছ। এস আমার সঙ্গে।'

পুষ্প এগিয়ে গেল। আসিফ বলল, 'চা খাবে?'

পুষ্প বলল, 'না।'

'একটু খাও। চা খাবার সময় মানুষ একটা কাজের মধ্যে থাকে। কাজের মধ্যে থাকলে আপনাআপনি মানুষ খানিকটা ফ্রি হয়ে যায়। তখন কথাবার্তা সহজ হয়।'

'এত কিছু আপনি জানেন কী ভাবে!'

'রাত–দিন তো এটা নিয়েই ভাবি। কাজেই কিছু কিছু জানি।'

পুষ্প চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার কি মনে হয় আমি পারব?'

'অবশ্যই পারবে। যারা অভিনয় করে না, তারা মনে করে অভিনয় ব্যাপারটা বুঝি খুবই কঠিন। আসলে তা না। অভিনয় খুবই সহজ।'

'আপনি আমাকে সাহস দেয়ার জন্যে এটা বলছেন।'

'মোটেই না। তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর তুমি এক জনের চরিত্রে অভিনয় করছ। অভিনয়ের অংশটা হচ্ছে প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তোমার রিঅ্যাকশান। এখন দেখ এই অভিনয়ের কোনো সেট প্যাটার্ন নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য ধরনের মানুষ। একেক জন মানুষ মৃত্যুর খবর একেকভাবে নেবে। এর যে কোনো একটা করলেই হল। তুমি গড়াগড়ি করে কাঁদলেও ঠিক আছে, আবার স্তব্ধ হয়ে

গেলেও ঠিক আছে।'

'এত সোজা?'

'হ্যাঁ, এই অংশটা সোজা। তবে সবচে কঠিন কাজ হচ্ছে, একবার একটা প্যাটার্ন নিয়ে নিলে গোটা নাটকে তা বজায় রাখতে হবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'এই নাটকে তুমি বালিকা বধূর চরিত্রে অভিনয় করছ। ঐ চরিত্রের একটা প্যাটার্ন তোমাকে তৈরি করতে হবে। কোনটা তুমি নেবে? সবচে সহজটা নাও, যেটা তুমি জান।'

'কোনটা আমি জানি?'

'তোমার নিজের চরিত্র তুমি জান। ঐ চরিত্রটাই তুমি স্টেজে নিয়ে আসবে। মঞ্চে তুমি দেখবে তোমার স্বামীকে। এই স্বামী কিন্তু মিথ্যা স্বামী না। মঞ্চে সে তোমার সত্যিকার স্বামী। এটা যখন তোমার মনে হবে তখনই তুমি পাশ করে গেলে।'

'আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই। তুমি সংলাপগুলো একটু দেখে নিয়ে মঞ্চে যাও, আমি তোমার ভয় কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'পুষ্প, আরেকটা কথা তোমাকে বলি শোন, এটাও খুব জরুরি। রিহার্সেলে রোজ বালিকা বধূর মতো সেজে আসবে। এতে সাহায্য হয়। ঘরোয়া ধরনের শাড়ি পরবে, চুলগুলো খোলা রাখবে। একটু পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ফেলবে। কাঁচের চুড়ি আছে না তোমার? হাতে বেশ কিছু কাঁচের চুড়ি পরে নিও। কথা বলার সময় হাত নাড়বে; চুড়ির ঝনঝন শব্দ হবে—এতে খুব সাহায্য হবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'এখন যাও নাটকটা একটু পড়। ছোট্ট দৃশ্য। দু'তিনবার পড়লেই মনে এসে যাবে। তোমার ভয়টা একটু কমেছে, না ভয় এখনো আছে?'

'এখনো আছে।'

'থাকবে না।'

দৃশ্যটা আসলেই ছোট। এই দৃশ্যেও লেখকের স্ত্রী লেখকের সঙ্গে রসিকতা করতে থাকে। লেখক ক্রমেই রেগে যেতে থাকে। এক সময় রাগ অসম্ভব বেড়ে যায়। সে তার স্ত্রীর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যে লেখক হতভম্ব হয়ে যান। গভীর বিস্ময় ও গভীর বেদনা নিয়ে লেখকের স্ত্রী লেখকের দিকে তাকান। লেখক এসে জড়িয়ে ধরেন তাঁর স্ত্রীকে। দু'হাতে স্ত্রীর মুখ তুলে চুমু খান তাঁর ঠোঁটে। পুষ্পের কেমন জানি লাগছে। সত্যি কি চুমু খাবে? সত্যি জড়িয়ে ধরবে? পুষ্পের গা কাঁপছে, খুব অস্থির-অস্থির লাগছে। তার ইচ্ছা করছে সে চেঁচিয়ে বলে—আমি এই দৃশ্য করব না। আবার করতেও ইচ্ছা করছে। স্বামীর প্রতি তার খুব রাগ লাগছে, আবার খুব মমতাও লাগছে। এ রকম এক জন লেখক স্বামী যদি তার হত তাহলে বেশ হত। তার ভাগ্যে কি আর এ রকম কেউ আসবে? হয়ত এলেবেলে ধরনের কারো সঙ্গে বিয়ে হবে। রাত জেগে গল্প করার বদলে সে হয়ত ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুবে। ঘুমের ঘোরে

ভারী একটা পা তুলে দেবে তার গায়ে।

আসিফ মঞ্চে এসে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, 'এস শুরু করা যাক।' বলেই সে বদলে গেল। পুষ্প মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল এই লোকটা নিমিষের মধ্যে কি করে যেন বদলে গিয়ে লেখক হয়ে গেল। লেখক এবং তার স্বামী। খুবই নিকটের কেউ।

লেখক : অসাধারণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে জরী। অসাধারণ উপন্যাসের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এটা শুরু হবে। একটা শহর। মনে করা যাক—এই ঢাকা শহর। এর উপর ঝড় আসছে, প্লাবন আসছে, মহামারী আসছে। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। কেমন হবে বল তো?

জরী : খুব ভালো হবে।

লেখক : একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়—প্রথমে ঝড়, তারপর বন্যা, তারপর.....

জরী : একটা ভূমিকম্প দিয়ে দাও।

লেখক : রাইট, ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জরী : বিরাট একটা ভূমিকম্প হোক। সেই ভূমিকম্পে পুরো ঢাকা শহর তলিয়ে যাক।

লেখক : ঠাট্টা করছ?

জরী : না, ঠাট্টা করছি না। একদিন দেখা যাবে যেখানে ঢাকা শহর ছিল, সেখানে বিরাট একটা হ্রদ।

লেখক : কী বলছ তুমি!

জরী : আমরা সেই হ্রদের পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বানাব। আমাদের একটা নৌকা থাকবে। নৌকায় করে আমরা হ্রদে ঘুরব।

[লেখক প্রচণ্ড রাগে স্ত্রীর গালে চড় বসিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলছেন।]

লেখক : প্লিজ, জরী প্লিজ। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুল করে ফেলেছি।

অভিনয় শেষ হয়েছে। আসিফ এখনো পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। হাতের বাঁধন এতটুকুও আলগা না করে সে বলল, 'মজনু গ্লাসে করে পানি আন তো, মেয়েটা ফেইন্ট হয়ে গেছে।'

আসিফ খুব সাবধানে পুষ্পকে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে সহজ গলায় বলল, 'বজলু ভাই, খুব বড় মাপের এক জন অভিনেত্রী পেয়ে গেলেন। আপনার উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।'

বজলু ভাই মানিব্যাগ বের করে সত্যি–সত্যি এক শ' টাকার একটা নোট বের করলেন মিষ্টির জন্যে।

পুষ্প টেবিলে উঠে বসে ঘোর লাগা চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। আসিফের দিকে চোখ পড়তেই আসিফ বলল, 'তুমি যে কত ভালো করেছ তুমি নিজেও জান না।'

পুষ্প কিছু বুঝতে পারছে না। সব কিছু তার কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেছে। এই জায়গাটা কী? তাদের বাসা? নাকি অন্য কোনো জায়গা?

৫

হাশমত আলি বিকেলে বাজার করে ফিরেছে। সস্তায় পেয়েছে দুটো বিশাল সাইজের ইলিশ। বৈশাখ মাসের শুরু—ইলিশ মাছে স্বাদ এসে গেছে। এই সময়ে এত সস্তায় ইলিশ পাওয়ার কথা না। ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে।

বারান্দায় মাছ কাটা হচ্ছে। বটিটা বেশ ধারাল—কচ-কচ করে কেটে যাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগছে। খুকিকে কোলে নিয়ে হাশমত আলি মুগ্ধ চোখে মাছ কোটা দেখছে। তার জীবনের এটা একটা আনন্দঘন মুহূর্ত।

লীনা চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাশমত বলল, 'ভাবি মাছ দেখলেন? পেটটা কেমন গোল। এর স্বাদই অন্যরকম। রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন ভাবি, মনে থাকে যেন।'

লীনা বলল, 'আমি তো খেতে পারব না। আপনার ভাইকে খাইয়ে দেবেন। আমি একটু মার বাসায় যাচ্ছি।'

'তাহলে এম্নি-এম্নি এক টুকরা মাছ খান। বেনু ভেজে দেবে।'

'না ভাই থাক।'

'এক মিনিট লাগবে। ইলিশ মাছ ভাজা হতে এক মিনিটের বেশি লাগে না।'

'আমার ইচ্ছা করছে না। শরীরটা ভালো না। ফ্রিজে থাকুক। একসময় খাব।'

'ফ্রেস জিনিস তো আর পাচ্ছেন না ভাবি।'

'ফ্রেস জিনিস তো সব সময়ই আপনার কাছ থেকে পাচ্ছি, তাই না? হাশমত সাহেব।'

'জ্বি ভাবি।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল—আপনি কি একটু বসার ঘরে আসবেন? বেনুর সামনে বলতে কেমন জানি সংকোচ বোধ করছি।'

বেনু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হাশমত আলি নিঃশব্দে উঠে এল বসার ঘরে। অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ভাবি?'

'এ মাসের বাড়ি ভাড়াটা কি আপনি দিয়ে দেবেন? একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি দিন দশেকের মধ্যে—'

'এটা কোনো ব্যাপারই না ভাবি। এটা নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। এই মাস কেন? দরকার হলে ছ' মাসের ভাড়া দিয়ে রাখব। আপনি আমাকে ভাবেন কী?'

লীনা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করছে। হাশমত আলিকে এই কথাটা কী করে বলবে এটা ভাবতে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। এখন মাথা ধরাটা নিমিষের মধ্যে চলে গেছে।

হাশমত আলি বলল, 'কথাটা বেনুর সামনে না বলে ভালো করেছেন। টাকা-পয়সার কোনো কথায় মেয়েছেলে থাকা উচিত না।'

লীনা হেসে বলল, 'আমি নিজেও তো মেয়েছেলে।'

'কী যে বলেন ভাবি, কোথায় আপনি আর কোথায় বেনু। আকাশ আর পাতাল ফারাক।'

লীনা বলল, 'আপনার ভাই এলে বলবেন আমি মার কাছে গিয়েছি। রাতেই ফিরব। সে যেন খেয়ে নেয়।'

'জ্বি আচ্ছা বলব। আপনি একটা ছাতা নিয়ে যান ভাবি। দিনের অবস্থা ভালো না। ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।'

'ছাতা লাগবে না।'

'লাগবে না বলছেন কি? অবশ্যই লাগবে। লেডিস ছাতা ঘরে আছে। ব্রান্ড নিউ। জাপানি।'

হাশমত নিজেই লেডিস ছাতা বের করে আনল।

লীনার বাবা ওয়াদুদুর রহমান সাহেব চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন। ঝিকাতলায় তাঁর জমি কেনা ছিল। রিটায়ার করবার সঙ্গে- সঙ্গে যুবকের উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বাড়ি। চমৎকার দখিনদুয়ারি বাড়ি। ইস্টার্ন রীতি অনুযায়ী বিরাট বারান্দা থাকবে, আবার ওয়েস্টার্ন ধরনে প্রতিটি ঘরে থাকবে বিল্ট ইন কাবার্ড। লোকজন বাথরুম বানানোয় কিপটেমি করে, তিনি করবেন না। বাথরুমে ঢুকেই যেন খোলামেলা ভাব হয়। প্রতিটি বাথরুমে থাকবে ঝকঝকে বাথটাব। দরজা-জানালা হবে সিজন করা বার্মা টিকের। আজকাল কী সব কাঠ দিয়ে দরজা-জানালা করে, গরম কালে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব প্রতিটি জিনিস নিজে পছন্দ করে কিনলেন। মিস্ত্রিরিরা সিমেন্ট বালি মিশিয়ে মশলা তৈরি করে, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। ইট বিছিয়ে দেয়াল তৈরি হয়—তিনি গভীর আগ্রহে দেখেন, মাঝে-মাঝে নির্দেশ দেন—ঐ ইটটা বদলে দাও বসির মিয়া। ইটটা বাঁকা।

বসির মিয়া বদলাতে চায় না। তিনি বড়ই বিরক্ত হন।

'আহা বদলাতে বললাম না? ইটের কি অভাব হয়েছে যে একটা ক্রিপলড ইট দিতে হবে। চেঞ্জ ইট।'

রিটায়ার করার পরও হয়ত ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের কুড়ি বছরের মতো আয়ু ছিল, সেই আয়ু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে তিনি খরচ করে ফেললেন। ছাদ ঢালাইয়ের পর দিন স্ট্রোকে মারা গেলেন।

কারো জন্যেই কিছু থেমে থাকে না। যথাসময় বাড়ি শেষ হল। দোতলা করা গেল না। একতলা বানাতেই সঞ্চিত প্রতিটি পয়সা শেষ হয়ে গেল। লীনার মা সুলতানা বেগম একতলা বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে থাকেন। বাকিটা ভাড়া দিয়েছেন তাঁর ডাক্তার জামাইকে। এই ডাক্তার জামাই বাড়িটাকে মোটামুটি একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে। রোজ বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে রুগী দেখা হয়। ভদ্রলোকের ভালো পসার হয়েছে। রুগীতে সারাক্ষণ বাড়ি ভর্তি থাকে। সুলতানার গা শিরশির করে, কিন্তু জামাইকে কিছু বলতে পারেন না।

আজ শুক্রবার। ডাঃ জামান শুক্রবারে রুগী দেখেন না, তবু দু'তিন জন রুগী বাইরের বারান্দায় বসে আছে। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে তারা কিছুতেই যাবে না। লীনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তাকেই ধরল, 'আপা ডাক্তার সাহেবকে একটু বলে দেন। খুব বিপদে পড়েছি।'

লীনা মার শোবার ঘরে ঢুকতেই একসঙ্গে সবাই হৈ-চৈ করে উঠল। লীনার বড়

বোন দীনা বলল, 'ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রিকশা নিয়ে চলে এলি? তোকে আনতে গাড়ি গেছে।' সবচে ছোট বোন নীনা বলল, 'একটা লেটেস্ট মডেল গাড়িতে চড়া মিস করলে আপা। দুলাভাই নতুন গাড়ি কিনেছে। বড় আপাদের এখন দুটো গাড়ি।' সুলতানা বললেন, 'জামাইকে আনলি না কেন? আমরা নাটক করি না বলে বুঝি আমাদের বাড়িতে আসা যাবে না।'

নাটকের একটা খোঁচা না দিয়ে সুলতানা মেজো জামাই সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। আজও পারলেন না। লীনার মনটা খারাপ হয়ে গেলেও সহজ স্বরে বলল, 'ওর কাজ আছে মা, রাত দশটার আগে ছাড়া পাবে না।'

সুলতানা তিক্ত গলায় বললেন, 'আমার তিন জামাইয়ের মধ্যে মেজোটাই সবচে কাজের হয়েছে। রাত দশটা–এগারটার আগে কোনোদিন ছাড়া পায় না।'

লীনা বলল, 'জামাই প্রসঙ্গ থাক মা। সবাই তো আর একরকম হয় না। কেউ কাজের হয়, কেউ হয় অকাজের—কি আর করা। কী জন্যে ডেকেছ বল? কারো জন্মদিন–টিন নাকি? আমি তো কিছু মনে করতে পারলাম না। ফুল নিয়ে এসেছি। যার জন্মদিন সে নিয়ে নিক।'

নীনা ছুটে এসে ফুল নিয়ে নিল। নীনার কাছ থেকে ফুল নেবার জন্যে বড় জামাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীনা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ আমার ফুলগুলো সেভ কর।' বলেই সে ফুলের তোড়া ক্রিকেট বলের মতো ছুঁড়ে মারল স্বামীর দিকে। সুলতানা কপট বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন, 'এরা সব সময় কি যে যন্ত্রণা করে। এই তোরা চা খাবি না কফি খাবি? যেটাই খাবি একটা। দু'তিন পদের জিনিস বানাতে পারব না।'

দীনা ও দীনার স্বামী জামান সাহেব বললেন, 'কফি।'

নীনা বলল, 'চা।'

নীনার স্বামী লুৎফুল হক চেঁচিয়ে বলল, 'সরবত।'

চারদিকে তুমুল হাসি শুরু হল। লীনা মনে–মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই সব চমৎকার হাসিখুশির মুহূর্তগুলোতে আসিফ কখনো অংশ নিতে পারে না। মাঝে–মাঝে সে যে উপস্থিত থাকে না তা নয়। থাকে, কিন্তু বড়ই বিব্রত বোধ করে। দেখে মনে হয় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সবাইকে একত্র করার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জামান সাহেব বললেন, 'রাতে খাওয়া–দাওয়ার পর অফিসিয়ালী সেটা বলা হবে। টপ সিক্রেট। এখন আমি আমার নতুন গাড়িতে সবাইকে নিয়ে একটা চক্কর দেব। এখান থেকে সাভার যাব—সাভার থেকে ফিরে আসব। টাটকা হাওয়ায় খিদেটা চাগবে। আমাকে বিশ মিনিটের জন্যে ক্ষমা করতে হবে। আমার কয়েকটা রুগী বসে আছে। বিদেয় করে আসি।'

লুৎফুল বলল, 'ছুটির দিনেও রুগী দেখেন। এত টাকা দিয়ে করবেন কী দুলাভাই? লোকজন ব্লাড প্রেসারে মারা যায়—আপনি দেখি টাকার প্রেসারে মারা যাবেন।'

জামান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। সুখী মানুষের হাসি। সুখী মানুষ অতি তুচ্ছ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়তে পারে।

নিমন্ত্রণের রহস্য জানা গেল রাতের খাবারের পর। জামান সাহেব ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে কাশ্মীর যেতে চান। শুধু কাশ্মীর না—আগ্রা, জয়পুর এবং কাশ্মীর। থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ তাঁর। দুই শ্যালিকা এবং শাশুড়ির টিকিটও উনি কাটবেন। অন্য কেউ যেতে চাইলে তাদের টিকিট তাদের কাটতে হবে। এই ভ্রমণে বাচ্চারা কেউ যাবে না।

লুৎফুল বলল, 'আমার টিকিট কাটবেন না, এর মানেটা কি দুলাভাই?'

'আমার কর্তব্য হচ্ছে শ্যালিকা পর্যন্ত, এর বাইরে না।'

নীনা বলল, 'আপনি কি সত্যি মিন করছেন দুলাভাই?'

'তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আছে। আপনার মধ্যে যে এক জন হাতেম তাই লুকিয়ে আছে সেটা জানা ছিল না।'

'এখন জানলে?'

'তা জানলাম। যাচ্ছি কবে আমরা?'

'সামনের মাসের এগার তারিখে, ফিরব বাইশ তারিখ। দীনা, তুমি ওদের টিকিট ওদের দিয়ে দাও।'

নীনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'টিকিটও কেটে ফেলেছেন!'

'অফকোর্স। আমি কাঁচা কাজ করি না। ঢাকা–দিল্লী–ঢাকা রিটার্ন টিকিট।'

নীনা কিছুই বলল না। চুপচাপ বসে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'আমার মেজো শালীকে দেখে মনে হচ্ছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। নীনা তুমি এমন মুখ কালো করে বসে আছ কেন?'

'আমার শরীরটা ভালো না দুলাভাই।'

'তুমি যাচ্ছ তো।'

'না দুলাভাই।'

'না কেন? তোমার বরকে ছেড়ে এই দশটা দিন তুমি থাকতে পারবে না?'

'তা না।'

'তাহলে অসুবিধাটা কোথায়।'

'অসুবিধা কিছু নেই।'

জামান সাহেব নিজেই নীনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। কোমল গলায় বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেতে চাচ্ছ না।'

নীনা বলল, 'আপনি ঠিকই বুঝেছেন।'

'কর্তাকে ছাড়া যেতে মন চাচ্ছে না?'

নীনা চুপ করে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'নীনা তোমাকে আমি খোলাখুলি কিছু কথা বলি। কিছু কিছু কথা সরাসরি হওয়াই ভালো। দেখ নীনা, তোমাদের আর্থিক অবস্থার কথা আমি ভালোভাবেই জানি। সেটা জেনে তোমার কর্তার জন্যে একটা টিকিট আমার কেনা উচিত। কিনতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মুশকিল কি জান? তোমাদের আত্মসম্মান বোধ অনেক বেশি। তোমরা আহত বোধ করবে। ভালো করতে গিয়ে মন্দ করা হবে। আমি সত্যি চাই তুমি যাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শরীর খারাপ। বেশ খারাপ। বাইরে একটু ঘুরে টুরে এলে ভালো লাগবে।'

লীনা কিছুই বলল না।

জামান সাহেব বললেন, 'আসিফকে নিয়ে গেলে আরেকটা বাস্তব সমস্যা আছে, সেটাও তোমাকে খোলাখুলি বলি। তোমার মা, আই মিন আমার শাশুড়ি আসিফকে তেমন পছন্দ করেন না। এগার দিন এক সঙ্গে থাকতে হবে। এর মধ্যে তিনি অনেকবার আসিফকে নিয়ে অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলবেন। তোমার খুব খারাপ লাগবে।'

লীনা বলল, 'আপনিই বা হঠাৎ দল বেঁধে বাইরে যাবার ব্যাপারে এত উৎসাহী হলেন কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে। টাকা বানানোর একটা মেশিন হয়ে পড়েছি। সারাদিন হাসপাতালে থাকি। বাসায় ফিরে বিশ্রামের বদলে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত রুগী দেখি। জীবনটা মানুষের রোগ-শোকের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। মুক্তি চাচ্ছি। কিছু সময়ের জন্যে হলেও মুক্তি। মাঝে-মাঝে তোমাদেরকে আমার বেশ হিংসাই হয়। মনে হয় বেশ সুখেই তো তোমরা আছ।'

'আপনি কি অসুখে আছেন?'

'হ্যাঁ অসুখেই আছি। উত্তরায় বাড়ি করছি। কত রকম প্ল্যানিং; কত পরিকল্পনা। ফলের গাছ কী কী থাকবে, ফুলের গাছ কী কী থাকবে। অথচ আমি নিজে ডাক্তার, আমি খুব ভালো করে জানি আমরা যে বেঁচে আছি এইটাই পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। দীর্ঘ পরিকল্পনা অর্থহীন।'

'ফিলসফার হয়ে যাচ্ছেন দুলাভাই। এটা তো ভালো লক্ষণ না।'

'ফিলসফার হতে পারলে তো কাজই হত। হাইলি মেটেরিয়েলিস্টিক মানুষ হয়ে জন্মেছি। এ ভাবেই মরব। আমার মতো সাকসেস্‌ফুল ডাক্তারদের এটাই হচ্ছে ডেসটিনি।'

অনেক রাতে আসিফের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, বাইরে ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। হাওয়ায় মশারি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আসিফ বিছানায় উঠে বসল। লীনা পাশে নেই। এটা নতুন কিছু না, প্রায় রাতেই ঘুম ভাঙলে লীনাকে পাশে দেখা যায় না। সে একাকী বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসে বাড়ির সামনের ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজও নিশ্চয়ই তাই আছে।

আসিফ বাতি জ্বালল না। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। লীনা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন সে জানত এই মুহূর্তে আসিফ এসে তার পাশে বসবে।

'কী করছ লীনা?'

'কিছু না। বৃষ্টি দেখছি।'

'ঘুম আসছে না?'

'উঁহু।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'দেখাব। বস আমার পাশে। বৃষ্টি দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

আসিফ বসতে বসতে মৃদু স্বরে বলল, 'একা একা বসে তুমি কী ভাব বল তো?'

'সাধারণত কিছু ভাবি না, আজ অবশ্যি ভাবছিলাম—কাশ্মীর জায়গাটা দেখতে

কেমন হবে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই না?'

'সুন্দর তো বটেই।'

'সব সুন্দর–সুন্দর জায়গাগুলো ইন্ডিয়াতে পড়ে গেল। রাগ লাগে না তোমার?'

'লাগে।'

'কাশ্মীর জায়গাটা কেমন হবে ভাবতে ভাবতে কী ঠিক করলাম জান? ঠিক করলাম আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঘুরেই আসব।'

'খুব ভালো, যাও ঘুরে আস। তোমার কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে পরে আমরা দু'জন আবার যাব। হাউস বোট ভাড়া করে থাকব।'

'কাশ্মীর দেখার জন্যে আমি যাচ্ছি না কিন্তু। আমি যাচ্ছি অন্য কারণে।'

'অন্য কারণটা কি?'

'আমি আজমীর যাব। আজমীর শরীফে গিয়ে যা চাওয়া যায় তাই না কি পাওয়া যায়। আমি ঐ জন্যেই যাব। যেন আমাদের এই বারের বাচ্চাটা বেঁচে থাকে।'

'ওর বয়স কত হল লীনা?'

'তিন মাস। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি কিন্তু ওর হার্টবিট বুঝতে পারি।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ সত্যি। তবে সব সময় না। গভীর রাতে যখন একা একা বসে থাকি তখন।

'এই জন্যেই কি তুমি রাত জাগ?'

'হুঁ।'

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার পাশে বসে থাকা এই মেয়েটি তার কত দিনের চেনা, অথচ গভীর রাতে সে যখন একা একা বসে থাকে তখন কেমন অচেনা হয়ে যায়।

লীনা বলল, 'অনেকদিন তোমাদের রিহার্সেলে যাই না। রিহার্সেল কেমন হচ্ছে?'

'বেশি ভালো হচ্ছে না। শো পিছিয়ে দিয়েছে, সব কেমন ঢিলাঢালা হয়ে গেছে।'

'পুষ্প মেয়েটা কেমন করছে?'

'ভালো করছে।'

'আমার চেয়েও ভালো?'

'হ্যাঁ তোমার চেয়েও ভালো।'

'আমাকে যেমন অভিনয়ের আগে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলে, ওকেও কি দিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা ষষ্ঠ দৃশ্যে তুমি যখন পুষ্পকে জড়িয়ে ধর, তখন তোমার কেমন লাগে?'

আসিফ অবাক হয়ে বলল, 'এই প্রশ্ন করছ কেন?'

'এম্নি করছি, কিছু মনে করো না।'

বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে। ঝড়ের মতো হচ্ছে।

জামগাছের পাতায় শোঁ–শোঁ শব্দ। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে গেছে। আসিফ বলল, 'চল শুয়ে পড়ি।' লীনা বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে এল। দু'জনের কেউই বাকি রাত ঘুমুতে পারল না। আসিফ জেগে জেগে শুনল বৃষ্টির শব্দ, লীনা শুনতে চেষ্টা করল অনাগত শিশুটির হৃৎপিণ্ডের শব্দ।

৬

হাঞ্চ ব্যাক অব মীরপুর পিঠ সোজা করে মতিঝিলের ট্রাভেল এজেন্সি সুরমা ট্রাভেলস–এ ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আসিফ। বিশাল অফিস। দু'জন স্টেনো বা রিসিপশনিষ্ট ধরনের মেয়ে বসা। এক জনের দিকে তাকান যায় না। মৈনাক পর্বত। তবে অন্যজন রূপবতী। মৈনাক পর্বত মধুর গলায় বলল, 'আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

বজলু সাহেব বললেন, 'কেরামত আছে?'

'জ্বি আছেন। এখন একটু ব্যস্ত।'

'আমিও ব্যস্ত। আপনি দয়া করে বলুন, ভৈরবের বজলু।'

মৈনাক পর্বত বিরক্ত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। বজলু আসিফকে নিচু গলায় বললেন, 'তুমি এখানেই বসে থাক। আমি একা যাই। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

আসিফ বলল, 'দরকার হবে বলে মনে করছেন?'

'অবশ্যই হবে। কেরামত আমার কথা ফেলবে না। ওর সেই ক্ষমতাও নেই। এস এম হলে লিটারেলি আমিই ওকে পেলেছি।'

'পুরানো কথা কেউ মনে রাখে না বজলু ভাই।'

'দেখা যাক। আগেই ডিসহার্টেড হচ্ছ কেন?'

বজলু এসেছেন আসিফের চাকরির ব্যাপারে। এসেছেন খুবই উৎসাহ নিয়ে। তাঁর ধারণা এই মুহূর্তেই একটা কিছু হবে। আসতে আসতে বলেছিলেন, 'তোমার চাকরি কোনো ব্যাপারই না। যে কোনো অফিসের এক জন বসকে ধরে এনে নাটক একটা দেখিয়ে দিলেই ব্যাটেল ইজ ও'ন।'

আসিফ কোনো প্রতিবাদ করে নি। যদিও বলতে চেয়েছিল নাটকের ক্ষেত্রে এটা কখনো হয় না। খেলোয়াড়দের ব্যাপারে হয়। ভালো ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকেট প্লেয়ারদের ডেকে ডেকে চাকরি দেয়। এরা অফিসের শোভা। কিন্তু নাটক করা লোককে কে রাখবে?

মৈনাক পর্বত বজলু সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল। আসিফ বসে রইল। সুন্দরী মেয়েটি বলল, 'আপনি চা খাবেন?'

'জ্বি খাব।'

মেয়েটি কেমন যেন আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে। কোনো একটা নাটক কি সে দেখেছে? অসম্ভব কিছু তো নয়। দেখতেও তো পারে। সুন্দরী মেয়েটি নিজেই চায়ের কাপ নিয়ে এগিয়ে এল। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনি কি মাধবীর ভাই?'

'জ্বি না।'

মেয়েটির সব আগ্রহ শেষ। সে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ল টেলিফোন নিয়ে। সম্ভবত চা এনে দেয়ায় নিজের উপরই সে এখন রাগ করছে।

কেরামত যতটা আন্তরিকতা দেখাবে বলে বজলু ভেবেছিলেন, সে তার চেয়েও বেশি দেখাল। জড়িয়ে ধরে নাচানাচি করল খানিকক্ষণ। গদগদ গলায় বলল, 'ভৈরবের বজলু যে তুমি তা বুঝতে পারি নি দোস্ত। বিশ্বাস কর। এই টাকা ছুঁয়ে বলছি। ব্যবসায়ী কখনো টাকা ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলে না।'

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'টুকটাক। ফাজিলের দেশ। ফাজিলের দেশে ব্যবসা করে সুখ নেই।'

'তুই তো মনে হচ্ছে সুখে আছিস।'

'টাকা আছে। মনে শান্তি নাইরে দোস্ত। কী জন্যে এসেছিস বল।'

'চাকরি দিতে হবে একটা।'

'এটা ছাড়া আর কিছু বলার থাকলে বল।'

'আর কিছু বলার নেই।'

কেরামত গম্ভীর হয়ে গেল। বজলু সিগারেট ধরালেন। এই ঘরের এয়ার কন্ডিশনার অনেক নিচে সেট করা। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। মনে হচ্ছে ফ্রিজের ভেতর তিনি বসে আছেন। কেরামত বলল, 'চাকরি কার?'

'আমার গ্রুপের এক জন।'

'তোর আবার কিসের গ্রুপ।'

'নাটকের গ্রুপ।'

'ও আচ্ছা, এখনো নাটক নিয়ে আছিস? ভালো। শিল্প-সাহিত্যের কোনো খবর রাখি না। আমার বউ বলছিল মহিলা সমিতিতে ভালো-ভালো নাটক হয়। সে একদিন দেখে আসল—কমেডি ধরনের কিছু হবে। রাতে ঘুমুতে গিয়েও একটু পর-পর হেসে ওঠে।'

বজলু বললেন, 'আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।'

'তোর ক্যান্ডিডেটের যোগ্যতা কি? মানে নাটক ছাড়া আর কী জানে?'

'বি. এ পাশ। শুরুতে ব্যাংকে চাকরি করত, তারপর ইস্টার্ন ট্রান্সপোর্টে কিছুদিন ছিল। জীবন বীমাতে কিছুদিন কাজ করেছে।'

'অচল মাল গছাতে চাচ্ছিস।'

বজলু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'আসিফের মতো ছেলেকে চাকরির জন্যে মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আফসোসের ব্যাপার। বিলেত আমেরিকা হলে এই ছেলে টাকার উপর শুয়ে থাকত।'

কেরামত বলল, 'কষ্ট করে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে এই ছেলেকে বিলেত আমেরিকা পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

বজলু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কেরামত বলল, 'ঠাট্টা করলাম রে দোস্ত। তোকে সত্যি কথা বলি—বিজনেসের অবস্থা খুবই টাইট। তবু তুই এসেছিস সেই খাতিরে আমি যা করতে পারি সেটা হচ্ছে—টাইপিস্টের একটা চাকরি দিতে পারি। তবে টাইপ জানতে হবে।'

বজলু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তবু বললেন, 'তোর এখানে হবে না বুঝলাম। উঠি।'

কেরামত বলল, 'রাগ করে উঠে যাচ্ছিস তা বুঝতে পারছি। উপায় নেই দোস্ত। আমার জায়গায় তুই থাকলে তুইও ঠিক এই কথাই বলতি। পুরনো দিনের খাতিরে এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যা। আমি মানুষটা খারাপ হতে পারি—আমার অফিসের চা কিন্তু ভালো।'

বজলু চা খেলেন না। অফিস থেকে বের হবা মাত্র তাঁর পিঠ আবার কুঁজো হয়ে

গেল। তবে বেশ শক্ত গলায় বললেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি একটা ব্যবস্থা করব। অবশ্যই করব। চল কোথাও বসে চা-টা কিছু খাওয়া যাক।'

আসিফ বলল, 'আমি একটু পুরানা পল্টনের দিকে যাব। এগারটার মধ্যে না গেলে কাজ হবে না। চা থাক।'

'চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপার?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও। তবে শোন, বিকেলে রিহার্সেলে আসার সময় কয়েক কপি বায়োডাটা নিয়ে আসবে।'

'দেয়ার মতো বায়োডাটা তো কিছু নেই।'

'যা আছে তাই আন না। আমার এক খালু আছেন খুবই হাই লেভেলের লোক। মন্ত্রী লেভেলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ। তাঁকে দিয়েই কার্য উদ্ধার করতে হবে। তুমি একেবারেই চিন্তা করবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'লীনার শরীর এখন কেমন?'

'ভালো।'

'ভেরি গুড। আমি দেখতে যাব। আজই যাব। রিহার্সেলের পর চলে যাব। রাতে খাব তোমাদের সাথে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'শোন আসিফ, টাকা পয়সা কিছু লাগবে?'

'এই মুহূর্তে না।'

'কোনোরকম সংকোচ করবে না। তোমার মতো মানুষকে এটা জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে—কী আফসোস বল তো।'

আসিফ হেসে ফেলল।

'হাসবে না, বুঝলে? এটা হাসির কোনো ব্যাপার না। এটা হচ্ছে একটা গ্রেট ট্র্যাজেডি।'

আসিফের তেমন কোথাও যাবার কথা ছিল না। বজলু সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই তার প্রথম উদ্দেশ্য। বজলু কাউকে ধরলে সহজে ছাড়েন না। আসিফ এখন কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বাসায় ফিরে যাওয়া যায়। খালি বাসায় ফিরে গিয়েই বা কী হবে? লীনা আছে স্কুলে। আজ আবার স্কুলে কিসের যেন পরীক্ষা। ছুটি হবে বিকেল পাঁচটায়। ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল—নামঞ্জুর হয়েছে। স্কুলের চাকরিটা লীনার ছেড়েই দিতে হবে। ভয়াবহ দিন সামনে। আসিফ হাঁটতে-হাঁটতে ভাবছে এইসব নিয়ে গুছিয়ে একটা নাটক লিখতে পারলে বেশ হত। তবে এই নাটক দর্শক নিত না। নাটকের বক্তব্য যাই হোক, তার মধ্যে বিনোদন থাকতে হবে। রিলিফ থাকতে হবে। পিকাসোর যে ছবি, তারও বিনোদনের একটি দিক আছে।

সবচে কঠিন বক্তব্যের নাটকেও আছে রিলিফের ব্যবস্থা। কুইনাইন সরাসরি গেলান যায় না। মিষ্টি চিনির প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়।

দুপুর দেড়টার দিকে আসিফ উপস্থিত হল তার বড় দুলাভাইয়ের অফিসে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অল্প যে ক'জনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ফরহাদ সাহেব

হচ্ছেন তাঁদের এক জন। এক সময় সরকারী চাকুরে ছিলেন। রোডস এন্ড হাইওয়েজের ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কনস্ট্রাকশান ফার্ম দিয়েছেন। সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবসা শুরু করলে দ্রুত বড়লোক হয়ে যায়। এর বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছে। আগে যা ছিলেন এখনো তাই আছেন। কাজকর্ম নাকি তেমন জোগাড় করতে পারেন না। আসিফ যখনই তাঁর কাছে আসে, দেখে—তিনি চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। হাতে ম্যাগাজিন। দেশি–বিদেশি অসংখ্য ম্যাগাজিন তাঁর টেবিলে থাকে। তিনি সব ম্যাগাজিন গভীর আগ্রহে পড়েন।

ফরহাদ সাহেব মানুষটা ছোটখাট। বেমানান বিশাল গোঁফ আছে। গোঁফের আড়ালে ঠোঁট ঢাকা বলে কখন হাসছেন তা বোঝা যায় না, মনে হয় সারাক্ষণই রেগে আছেন। আসিফকে ঢুকতে দেখে হাতের ম্যাগাজিন না নামিয়ে এবং আসিফের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'টাকা ধার চাইতে এসেছ?'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত?'

'লাখ খানিক।'

'বস।'

আসিফ বসল। ফরহাদ ম্যাগাজিন নামিয়ে রাখলেন, গোঁফের আড়ালে হাসলেন। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিছু হয় নি এখনো?'

'না।'

'হবে বলে কি মনে হচ্ছে?'

'না, হচ্ছে না।'

'হতাশ?'

'জ্বি হতাশ।'

'খুব হতাশ?'

'হ্যাঁ।'

'দুপুরে খাওয়া হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'চল কোথায়ও গিয়ে খাই। পেটে ক্ষুধা থাকলে হতাশ ভাবটা বেশি থাকে। জাতি হিসেবেই আমরা হতাশ কেন জান? হতাশ, কারণ বেশির ভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

"না বোঝ নি। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ; যেখানে ক্ষুধাকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। এই দেশের কবি লেখেন, 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান।' দারিদ্র মানুষকে মহান করে না, পঙ্গু করে ফেলে।"

'খুবই ফিলসফিক কথাবার্তা বলছেন দুলাভাই।'

'বলছি, কারণ আমার অবস্থা কাহিল। তোমার বোন সেই খবরটা এখনো জানে না। সে সুখে আছে'

'ব্যবসাপাতি খারাপ যাচ্ছে?'

'ইয়েস। কী পরিমাণ খারাপ, তুমি চিন্তা করতে পারবে না। মোটা এমাউন্টের টাকা ঘুষ দিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট দেই। কাজ শুরু মাত্র সবাই হাঁ করে ফেলে—প্রতিটি মানুষকে টাকা খাওয়াতে হয়।

যে রাস্তায় ছ ইঞ্চি বিটুমিন দেয়ার কথা সেখানে দিই এক ইঞ্চি। প্রথম বৃষ্টিতেই সেই বিটুমিন ধুয়ে মুছে যায়। আবার টেন্ডার হয়। আবার টাকা খাওয়াখাওয়ি। তুমি বিশ্বাস কর—বাংলাদেশে কোথাও কোনো সৎ মানুষ নেই। সৎ মানুষ এখন আছে কোথায় জান? গল্প, উপন্যাস এবং তোমাদের নাটকে।'

ফরহাদ সাহেব আসিফকে নিয়ে দামি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন। নতুন রেস্টুরেন্ট, বিদেশিরাই বেশিরভাগ ভিড় করেছে। রেস্টুরেন্টের বিশেষত্ব হচ্ছে সঙ্গে বার আছে। ফরহাদ সাহেব খাবারের অর্ডার দিয়ে পর-পর ছ'পেগ হুইস্কি খেয়ে চোখ লাল করে ফেললেন। আসিফ অবাক হল। ফরহাদ সাহেবের এই ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। ভালো মানুষ ধরনের লোক ছিলেন। তাঁর ব্যবহার এবং স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে দুপুরবেলায় মদ্যপানটা ঠিক মানাচ্ছে না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আসিফ তোমরা নাটক কেন কর?'

আসিফ কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব মুখ খানিকটা এগিয়ে এনে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'পত্রিকা ওল্টালেই দেখি গ্রুপ নাটকের মটো হচ্ছে—আমরা নাটক করি সমাজ বদলাবার জন্যে। এইসব ফালতু কথা তোমরা কেন বল? মহিলা সমিতির ফ্যানের নিচে দেড় ঘন্টার একটা নাটক করে তোমরা সমাজ বদলে ফেলবে? সমাজ কোথায় আছে তোমরা জান?'

আসিফ হাসল। ফরহাদ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'হেসে ফেললে? আমি কি খুব হাস্যকর কিছু বলেছি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাজ কোথায় আছে তোমরা জান না।'

'আপনি জানেন?'

'কিছুটা জানি। মাঝে-মাঝে প্রচুর মদ্যপান যখন করি তখন কিছুটা ইনসাইট ডেভেলপ করে।'

ফরহাদ সাহেব আরো এক পেগের অর্ডার দিলেন। আসিফ একবার ভাবল বলবে—দুলাভাই বেশি হয়ে যাচ্ছে।

কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব গলা নিচু করে বললেন, 'থিয়েটার-ফিয়েটার কর। তোমার সন্ধানে সতের-আঠার বছরের কচি মেয়ে আছে? যে সাতান্ন-আটান্ন বছরের এক জন বুড়োর সাথে কোনো একটা ভালো হোটেলে এক রাত থাকবে? আছে এ রকম কিছু তোমার সন্ধানে?'

'দুলাভাই, আপনি কী বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারবে না জানি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার আঠারো লাখ টাকার একটা বিল আটকে আছে। আটকেছে মাত্র এক জায়গায়। যেখানে আটকেছে সেখানে যিনি আছেন তাঁর বয়স সাতান্ন-আটান্ন। তিনি আমাকে ডেকে বলেছেন, 'লাইফ খুব ডাল হয়ে যাচ্ছে—এটাকে ইন্টারেস্টিং করার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই পারি।'

উনি বললেন, 'আপনাকে বলতে একটু ইয়ে লাগছে—'

আমি বললাম, 'আপনি কোনোরকম সংকোচ করবেন না স্যার।' তখন উনি বললেন, 'আজকাল শুনতে পাই ভেরি ইয়াং গার্লস, অনেকটা এ্যাডভেঞ্চারের লোভে হোটেলে-টোটেলে রাত কাটাচ্ছে. . . বুঝতে পারছেন কী মিন করছি?'

আমি বললাম, 'পারছি।'

তিনি বললেন, 'জাস্ট একটা এক্সপেরিয়েন্সের জন্যে। পারা যাবে?' আমি বললাম, 'অবশ্যই। এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আসিফ বলল, 'আপনি কি কোনো ব্যবস্থা করলেন?'

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আমি কী করলাম শোন, অফিসে এসে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার মেঝো মেয়ে সুমি—ওর বয়স সতের। চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল, যেন সুমি এই লোকটার কোমর জড়িয়ে হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মাথায় আগুন লেগে গেল। কী করলাম জান?'

'কী করলেন?'

'ভদ্রলোকের স্ত্রীকে টেলিফোনে সমস্ত ব্যাপারটা বললাম।'

'তারপর?'

'তারপরের কথা কিছু জানি না।'

'আপনার বিল? আপনার বিলের কী হল?'

'ঐসব এখন জানতে চাওয়া কি অর্থহীন না?'

ফরহাদ সাহেব খাবার মুখে দিচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘাস চিবুচ্ছেন। অনেক কষ্টে কুৎসিত কিছু গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন। খানিকক্ষণ পর-পর পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

'আসিফ।'

'জ্বি।'

'মনটা খুব অস্থির। কোনো কিছুই ভালো লাগে না। অফিসে বসে সারাদিন শুধু ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাই। নাটক-ফাটক দেখলে মনটা ভালো হবে নাকি বল তো? ভালো কিছু কি হচ্ছে?'

আসিফ জবাব দিল না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'রিয়েল ওয়ার্লড থেকে আনরিয়েল ওয়ার্লডে খানিকক্ষণের জন্যে হলেও ঢুকতে ইচ্ছা করে। টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা এইসব নাটক কি আজকাল হয়, আসিফ?'

'মফস্বলের দিকে হয়।'

'তোমরা কর না কেন? ফ্যান্টাসি ধরনের জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। মশিয়ে লালী, নানা ফারনাবিশ, ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাই না? তারপর একটা মেয়ে ছিল না? যে বলল—আমার বাপুজী জৌতিষ চর্চা করেন। টিপু সুলতান বলল, 'কে তোমার বাপুজী, কি তার পরিচয়?' মেয়েটি বলল, 'বাপুজীকে আপনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাঁর গণনায়।'

আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনার মনে হয় খানিকটা নেশা হয়ে গেছে।'

ফরহাদ সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ হয়েছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি। অভ্যাস নেই। তার উপর গরমটাও পড়েছে প্রচণ্ড। অল্পতেই..... চল উঠে পড়ি।'

'আপনি তো কিছুই খেলেন না।'

'ইচ্ছা করছে না। টেস্টলেস সব খাবার। মনে হচ্ছে মানুষের বমি খাচ্ছি। ভালো কথা, বমির ইংরেজি কি জান না কি? কয়েকদিন ধরেই ভাবছি কাউকে জিজ্ঞেস করব—মনে থাকে না।'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব আরো ঝিম মেরে গেলেন। আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনি কি গাড়ি চালাবেন?'

'ইয়েস। ভয় নেই, এক্সিডেন্ট করব না। স্টিয়ারিং হুইল ধরামাত্র আমি সোবার হয়ে যাই। তাছাড়া ধর এক্সিডেন্ট যদি করেই ফেলি, তেমন কী আর হবে?'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব সত্যি-সত্যি সোবার হয়ে গেলেন। সহজভাবে গাড়ি চালাতে লাগলেন। হাসিমুখে বললেন, 'ভয় কমেছে?'

'কমেছে।'

'আসিফ, তোমার জন্যে আমি একটা ব্যবস্থা করে দেব। চিন্তা করবে না। আমাকে খানিকটা সময় দাও—ধর মাস খানিক।'

'থ্যাংকস দুলাভাই।'

'কোথায় যাবে বল, তোমাকে নামিয়ে দিই।'

'যে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে। আমার বিশেষ কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই।'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি পার্ক করলেন। আসিফ নেমে পড়ল। ফরহাদ সাহেব বললেন, 'এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কিছু মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। সত্যি কথাটা বলে ফেলি।'

'কোন বিষয়ে?'

'আমি ঐ লোকের স্ত্রীকে টেলিফোন করি নি। ভদ্রলোক যেমন চেয়েছেন সেই মতো ব্যবস্থা হয়েছে। গত পরশু আমি বিল পেয়েছি। যাই, কেমন?'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলেন। রাস্তায় যানবাহনের জটলা, কিন্তু তাঁর গাড়ি দ্রুত চলছে। আসিফ লাল রঙের গাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল।

একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। আসিফ নিজের আত্মীয়-স্বজন কারোর সঙ্গেই কেমন যেন সহজ হতে পারে না। অদৃশ্য একটা পর্দা থেকেই যায়। অথচ এই মানুষটিকে খুবই আপন মনে হয়। যদিও আসিফের বোনের সঙ্গে এই লোকটির তেমন অন্তরঙ্গতা বিয়ের এত বছরেও তৈরি হয় নি। কুৎসিত সব ঝগড়া হয়।

অন্য বোনদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের ভাব-টাব কেমন আসিফ জানে না। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। মা বেঁচে থাকতে খানিকটা যোগাযোগ ছিল। মা পালা করে একেক মেয়ের বাসায় থাকতেন। ঈদ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোনদের সঙ্গে দেখা হত। বোনরা কড়া কড়া কথা শোনাত, যার মূল ভাব একটিই—আসিফ ভয়াবহ একটা চরিত্র। আসিফের মেজো বোন একটি কথা প্রায় সরাসরি বলে, 'বাবা এত সকাল সকাল মরে গেল শুধু মাত্র আসিফের কারণে। আসিফ বাবাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেই ইচ্ছা করেই পড়াশোনা ছেড়ে দিল। নয়ত যে ছেলে ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় ডিসট্রিক্টে ফার্স্ট হয়, সে কী করে ম্যাট্রিক প্রথমবারে ফেল

করে দ্বিতীয়বারে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে, আই.এ তে কম্পার্টমেন্টাল পায়। বাবা মরে গেল এই দুঃখে।'

যে কোনো কথাই অনেকবার শুনলে সেটাকে সত্যি মনে হয়। রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই মুহূর্তে আসিফের মনে হচ্ছে মেজো আপার কথা সত্যি হলেও হতে পারে। বৈশাখ মাসের দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে সে খানিকটা বিষণ্ন বোধ করল। তার মনে হল সব মানুষের অন্তত একবার করে হলেও জীবন গোড়া থেকে শুরু করার সুযোগ থাকলে ভালো হত। বড় ধরনের ভুলগুলোর একটি অন্তত শোধরান যেত।

তার সবচেয়ে বড় ভুল কোনটা? নাটক? আর লীনা? লীনাও কি তার মতো বড় কোনো ভুল করেছে? একবার তাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?

আসিফ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। আশেপাশে পানি খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকা শহরের নানান জায়গায় এখন চমৎকার ফোয়ারা। এই সব ফোয়ারার পানি কি খাওয়া যায়? প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারার পানি একবার এক তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধকে খুব আগ্রহ করে খেতে দেখেছিল। বৃদ্ধের চেহারা বেশ সভ্রান্ত। হাতে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের লোকদের মতো চামড়ার ব্যাগ। সে এই ব্যাগ পাশে রেখে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ আয়োজন করে পানি খেল। দৃশ্যটা আসিফের এতই মজা লাগল যে সে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে আসিফকে বললেন, 'সরকার পানি খাওনের ভালো ব্যবস্থা করছে। খুবই উত্তম ব্যবস্থা।'

আসিফের ইচ্ছা করছে এই রকম কোনো একটা ফোয়ারার কাছে গিয়ে ঐ বৃদ্ধের মতো হাত-মুখ ধুয়ে খুব আয়োজন করে খানিকটা পানি খায়। লোকজন পাগল ভাববে নিশ্চয়ই। ভাবুক। মাঝে-মাঝে পাগল হতে ইচ্ছা করে।

সে সত্যি-সত্যি হেঁটে হেঁটে প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারাটার কাছে এল। ফোয়ারা বন্ধ। শুকিয়ে খট খট করছে। কিছু জিজ্ঞেস না করতেই একজন বলল, 'সন্ধ্যার সময় লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া ছাড়ে।' সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করলে কেমন হয়?

আসিফ নিজের পাগলামীতে নিজেই হেসে ফেলল।

৭

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে।

মজনু চুলায় কেতলি চাপিয়ে বিরক্ত মুখে বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টি মানেই যন্ত্রণা। চা বেশি লাগবে। দু'বারের জায়গায় তিনবার কেতলি বসাতে হবে। তিনবারের মতো চা পাতা নেই। চা পাতা আনতে যেতে হবে। রিহার্সেলের সময় বাইরে যেতে তার ভালো লাগে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখলে মজা কোথায়? তা ছাড়া বৃষ্টির সময় সবাই আসেও না। রিহার্সেল ঠিকমতো হয় না। আগে আগে শেষ হয়ে যায়। রিহার্সেল বাদ দিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করে। আগে কাজ, পরে গল্পগুজব। এই জিনিসটা

এরা বোঝে না। ছাগলের দল।

কেতলিতে চায়ের পাতা ফেলে মজনু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে লাস্ট সিনটা আজও হবে না। লাস্ট সিনটাই সবচে মারাত্মক। প্রায় দিনই এই সিন হচ্ছে না। আজমল সাহেব আসে না। তাঁর নাকি মায়ের অসুখ। লাস্ট সিনের মেইন একটর হচ্ছে আজমল হুদা। মজনুর মতে আজমল সাব হচ্ছে এই টিমের দুই নম্বর একটর। এক নম্বর আসিফ সাব। এই দুই জন না থাকলে টিম কানা। তবে নতুন মেয়ে পুষ্প মন্দ না। লীনা আপার কাছাকাছি। কিংবা কে জানে লীনা আপার চেয়েও বোধ হয় ভালো। তবে লীনা আপা ডায়লগ দেবার সময় শুরুর সব কথাতেই কি সুন্দর করে হাসে, এই মেয়ে সেটা করে না। এই মেয়ে একটু বেশি গম্ভীর। এই গাম্ভীর্যটাও ভালো লাগে। হাসিটাও ভালো লাগে। কে জানে কোনটা বেশি ভালো।

মজনু ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দেবার মূল কারণ আজমল হুদা এসেছে কিনা তা দেখা।

না আসে নি।

তার মায়ের অসুখ বোধ হয় আরো বেড়েছে। এইসব বুড়া–বুড়ি মা বাবা নিয়ে বড় যন্ত্রণা। কাজের কাজ কিছু করে না, অসুখ বাঁধিয়ে অন্য সবের কাজের ক্ষতি করে। মজনুর খুবই মন খারাপ হল। এর মধ্যেও যা একটু আনন্দের ব্যাপার তা হচ্ছে অনেকদিন পর লীনা আপা এসেছে। একদম কোণার দিকের একটা চেয়ারে একা–একা বসে আছে। স্টেজের উপরে আসিফ এবং পুষ্প। আসিফ নিচু গলায় পুষ্পকে কি যেন বলছে, পুষ্প মন দিয়ে শুনছে। লীনা আপা একদৃষ্টিতে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে।

মজনু লীনার সামনে এসে বলল, 'কেমন আছেন আফা?'

'ভালো। তুই কেমন আছিস রে মজনু?'

'জ্বি ভালো।'

লীনা হাসিমুখে বলল, 'পুষ্প কেমন পার্ট করছে রে মজনু? তোর তো আবার সব কিছুতে নম্বর দেয়া। পুষ্প কত নম্বর?'

'তিন নম্বরে আছে আফা।'

'দু নম্বরে কে আছে?'

'আজমল সাব?'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। কাজটা অনুচিত হইছে আফা। আজমল সাবের মতো লোকরে ছোড একটা পাট দিছে।'

'ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল। তার উপর ভর করেই তো নাটক দাঁড়িয়ে আছে।'

'কথাডা ঠিক।'

মজনুর বড় ভালো লাগে। লীনা আপা তার সাথে হেলা ফেলা করে কথা বলে না। তার কথা শুনে অন্যদের মতো হেসে ফেলে বলে না—যা ভাগ। কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল কেন আজমল সাবের পার্ট এত ছোট। জিনিস থাকলে ছোট পার্ট দিয়েও আসর মাত করা যায়।

আজমল সাব যতক্ষণ স্টেজে থাকে ততক্ষণ শরীরের রক্ত গরম হয়ে থাকে। মনে হয় কি শালার দুনিয়া। লাথি মারি দুনিয়ায়।

লীনা বলল, 'আজ আমাকে একটু চা দিস তো মজনু। চা খেতে ইচ্ছা করছে।'

'আনতাছি আফা। হুনলাম বিদেশ যাইতাছেন?'

'ইন্ডিয়া যাচ্ছি, দূরে কোথাও না। তুই কার কাছে শুনলি?'

'বলাবলি করতেছিল। কবে যাইতেছেন আফা?'

'পরশু। পরশু রাত ন'টার ফ্লাইটে। তোর জন্যে কি কিছু আনতে হবে?'

'না আফা।'

আনন্দে মজনুর চোখে প্রায় পানি এসেই যেত, যদি না প্রণব বাবু চেঁচিয়ে বলতেন, 'গাধা, চা কই? এক ঘন্টা আগে চা দিতে বলেছি।' মজনু চা আনতে গেল। চা বানাতে–বানাতেই শুনল সেকেণ্ড সিন হচ্ছে। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। প্রতিটি ডায়লগ তার মুখস্থ। অনেকেই যেমন গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়, মজনুও অভিনেতার সঙ্গে–সঙ্গে অভিনয় করে। তার বড় ভালো লাগে। এই মুহূর্তে সে করছে লেখকের ভূমিকা। তার মনে হচ্ছে সে খুব ভালো করছে। মনটা তার খানিকটা খারাপও লাগছে। এত চমৎকার অভিনয়, অথচ কেউ দেখতে পারছে না। অন্তত এক জন যদি দেখত।

মজনুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। মোটর সাইকেল ভট ভট করতে করতে আজমল চলে এসেছে। লাস্ট সিনটা আজ তাহলে হবে। ঘুম ভেঙে আজ সে কার মুখ দেখেছিল কে জানে। বিউটি সেলুনের ছেলেটার মুখ বোধ হয়। ঐ ছেলেটার মুখ দেখলে তার দিনটা খুব ভালো যায়।

আজমল লীনার পাশের চেয়ারে এসে বসেছে। সে সিটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। তার বিশাল চেহারা, বিশাল গোঁফ দেখে ঠিক অনুমান করা যায় না। বড়–সড় চেহারার মানুষগুলোর গলার স্বর সাধারণত খুব কোমল হয়। আজমলের বেলায় তা হয় নি। সে কথা বললে হল কাঁপে।

লীনা বলল, 'আপনার মার শরীর এখন কেমন?'

আজমল বলল, 'ভালো, মানে খুব না, খানিকটা ভালো। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। হাঁটুতে কি একটা অপারেশন না কি হবে।'

'কবে হবে?'

'জানি না কবে। বউ দৌড়াদৌড়ি করছে, সে–ই জানে?'

স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে আজমল ভ্রূ কুঞ্চিত করল। লীনা হাসি মুখে বলল, 'ভাবির সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে?'

'হুঁ।'

'এবার কী নিয়ে ঝগড়া করলেন?'

'তার ধারণা আমি কোনো কিছুই দেখি না। শুধু নাটক নিয়ে থাকি।'

'ধারণা কি ভুল?'

'অবশ্যই ভুল। নিয়মিত ক্লাস করি। প্রাইভেট টিউশানি করি, প্রতিদিন সকালে বাজার করি। এরচে বেশি কোন পুরুষটা কী করে? ঝগড়া করার জন্যে অজুহাত দরকার, এটা হচ্ছে একটা অজুহাত। ঐ যে সিংহ ছাগল ছানার গল্প। সিংহ বলল,

ব্যাটা তুই জল ঘোলা করছিস কেন?. . .'

লীনা বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে ভাবির উপর খুব রেগেছেন।'

'রাগব না? অফকোর্স রাগব।—ভাবি, এটাই কি নতুন মেয়ে নাকি? বাহ্, অভিনয় তো খুব ভালো করছে। একসেলেন্ট—নাম কি?'

'পুষ্প।'

'মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাবি।'

'কেন?'

'এই মেয়েকে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। টেলিভিশন ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে, তারপর আসবে ফিল্মের লোকজন। আর তা যদি নাও আসে মেয়েটির অভিনয় দেখে কোনো এক জন ছেলে তার প্রেমে পড়বে। বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের পর ঐ ছেলে আর মেয়েটিকে অভিনয় করতে দেবে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ভাবি। খুবই খারাপ। মেয়েটার কী নাম বললেন?'

'পুষ্প।'

'আমি নিজেই তো মনে হচ্ছে প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। মাই গড, দারুণ মেয়ে তো।'

লীনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। স্টেজ থেকে বিরক্ত চোখে আসিফ তাকাচ্ছে। লীনা হাসি বন্ধ করার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল। তার এই জাতীয় হাসাহাসির মূল কারণ হচ্ছে যখনই গ্রুপে কোনো নতুন মেয়ে আসে, আজমল সবাইকে বলে বেড়ায় সে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে।

আসিফ লীনাকে নিয়ে রিকশা করে ফিরছে। জলিল সাহেব একটা পিকআপ নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লিফট দিতে চাইলেন। আসিফ রাজি হল না। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে বাড়ি ফেরার নাকি আলাদা একটা মজা আছে।

বৃষ্টি অবশ্য থেমে গেছে। তবে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিজলি চমকাচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে। ঢাকা শহরে এখনো ব্যাঙ আছে। এবং বৃষ্টি দেখলে এরা গলা ফুলিয়ে ডাকে—এটাই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। লীনা বলল, 'ব্যাঙ ডাকছে, শুনছ?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'গ্রাম-গ্রাম লাগছে না?'

'কিছুটা।'

'এত বড় শহর হয়েও ঢাকার মধ্যে গ্রাম ব্যাপারটা রয়েই গেল।'

'হ্যাঁ। আজিমপুরের কাছে যারা থাকে তারা শেয়ালের ডাকও শোনে। ঐদিকটায় এখনো শেয়াল আছে।'

খানাখন্দ ভরা রাস্তা। রিকশা খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আসিফ ডান হাত দিয়ে লীনাকে জড়িয়ে ধরল। লীনার গা একটু যেন কেঁপে উঠল। সে নিজে এতে খানিকটা অবাকও হল। এত দিন পরেও আসিফ তার গায়ে হাত রাখলে গা কেঁপে ওঠে। মনটা তরল ও দ্রবীভূত হয়ে যায়। কোত্থেকে যেন উড়ে আসে খানিকটা বিষণ্নতা।

আসিফ বলল, 'শীত লাগছে লীনা?'

'না।'

'পুষ্পের অভিনয় কেমন দেখলে?'

'ভালো, খুব ভালো। কল্পনা করা যায় না এমন ভালো।'

'আসলেই তাই।'

লীনা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'ও যে কেন এত ভালো অভিনয় করছে তা কি তুমি জান?'

আসিফ গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি।'

'বল তো কেন?'

'ধাঁধা?'

'হ্যাঁ ধাঁধা। বলতে পারলে তোমার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

'কী পুরস্কার?'

লীনা ইংরেজিতে বলল, 'ঝড়–বৃষ্টির রাতে যে ধরনের পুরস্কারে পুরুষরা সবচে বেশি আনন্দিত হয় সেই পুরস্কার।'

আসিফ সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে সহজ গলায় বলল, 'মেয়েটা খুব ভালো অভিনয় করছে, কারণ সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। ধাঁধার জবাব কি ঠিক হয়েছে লীনা?'

লীনা বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। ব্যাপারটা তুমি কখন টের পেলে?'

'প্রথম দিনেই টের পেলাম। অভিনয়ের এক পর্যায়ে তার হাত ধরতে হয়। হাত ধরেছি, হঠাৎ দেখি থরথর করে তার আঙুলগুলো কাঁপছে।'

'ভয় থেকেও কাঁপতে পারে। নার্ভাসনেস থেকেও পারে।'

'তা পারে। তবে এতদিন হয়ে গেল অভিনয় করছে, এখনো তার হাত ধরলে এরকম হয়।'

লীনা চুপ করে রইল। আসিফ হেসে বলল, 'একই ব্যাপার কিন্তু তোমার বেলায়ও ঘটে। হাত ধরলে তুমিও কেঁপে ওঠ। তুমি নিজে বোধ হয় তা জান না। নাকি জান?'

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'জানি।'

আসিফ বলল, 'পুষ্পের ব্যাপারে তোমার কি. . . . '

লীনা আসিফকে কথা শেষ করতে দিল না। কথার মাঝখানেই বলল, 'আজিমপুরের দিকে সত্যি–সত্যি শেয়াল ডাকে নাকি? একদিন শেয়ালের ডাক শোনার জন্যে যেতে হয়। অনেকদিন শোনা হয় নি।'

'তুমি ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আস, তারপর একদিন যাব।'

আসিফ বাঁ হাতে লীনার হাত মুঠো করে ধরল। লীনার আঙুল কেঁপে উঠল। আসিফ লীনার দিকে না তাকিয়েই তরল গলায় হাসল।

৮

পুষ্প থাকে পুরনো ঢাকায়।

চানখাঁর পুল থেকে ভেতরের দিকে যেতে হয়। বিরাট দোতলা বাড়ি। উপরের তলা ভাড়া দেয়া। নিচের তলায় ভাগাভাগি করে পুষ্পরা থাকে এবং পুষ্পের বড়চাচা

থাকেন। পুষ্পের বাবা এবং বড়চাচা দু'জনেই ওকালতি করেন। দু'জনেরই পসার নেই। পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ওকালতি ছাড়াও হোমিওপ্যাথি করেন। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর কিছুটা পসার আছে। লোকজন বাসায় এসে ভিজিট দিয়ে ব্যবস্থাপত্র নেয়।

পুষ্পদের বাসায় অনেকগুলো ভাইবোন। নিজের এবং চাচাতো বোনদের সংখ্যা সাত। ভাই ছ'জন। এরা রাতে কে কোথায় ঘুমায় কোনো ঠিক নেই। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাতে এক জন পড়াশোনা শেষ করে উঠেছে। কোথায় ঘুমাবে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রান্না দু'বাড়িতে আলাদাভাবেই হয়, তবে কে কোন বাড়িতে খাবে তারও কোনো ঠিক নেই। পুষ্পের বড়চাচা খলিলুদ্দিন বেশিরভাগ সময়ই পুষ্পদের সঙ্গে খান। নিজের স্ত্রীর রান্না তিনি খেতে পারেন না। খেতে বসে বেশিরভাগ সময়ই খুব অপমানসূচক কথা বলেন। আজ তাই বলছেন। আজ রান্না হয়েছে তেলাপিয়া মাছ। তিনি মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিলেন এবং থমথমে গলায় বললেন, 'জিনিসটা কি?'

তাঁর স্ত্রী হাসিনা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তেলাপিয়া মাছ।'

'তেলাপিয়া মাছ রাঁধতে তোমাকে কে বলল?'

'সবাই খায়।'

'সবাই খায়? কোন শালা তেলাপিয়া মাছ খায়? বল কোন শালা খায়?'

তিনি মাছের বাটি উল্টে ফেলে গট গট করে উঠে পাশে ছোট ভাইয়ের বাসায় খেতে গেলেন। সেখানেও তেলাপিয়া মাছ রান্না হয়েছে। তবে সেখানে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

পুষ্প এই দুই পরিবারেরই বড় মেয়ে। পরিবারে সবচে বড় মেয়েকে কখনো ঠিক বড় মনে হয় না। মনে হয় সে ছোটই রয়ে গেছে। পুষ্প সম্পর্কে এই ধারণা আরো কিছুদিন থাকতো, তবে এখন আর নেই। পুষ্প রিহার্সেলে রোজ শাড়ি পরে যাচ্ছে। শাড়ি পরলেই মেয়েটাকে তরুণীর মতো দেখায়।

পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ভেবেছিলেন দু'এক দিনের ব্যাপার। এখন মনে হচ্ছে দু'একদিনের ব্যাপার না। রোজই যাচ্ছে। ওরা অবশ্যি গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে। এবং দোতলার ভাড়াটে মেয়েটাও যাচ্ছে। তবু একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। স্বভাব-চরিত্রে কোনো দাগ পড়ে গেলে মুশকিল।

এজাজুদ্দিন স্ত্রীকে ক'দিন ধরেই এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। গম্ভীর গলায় বলছেন, 'একটা দাগ পড়ে গেলে খুব মুশকিল। দাগ তো শরীরের কোনো অসুখ না যে থুজা টু হানড্রেড দেব আর রোগ আরাম হবে।'

এজাজুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী মমতা তাঁর স্বামীর কোনো মতামতকেই তেমন পাত্তা দেন না। মেয়ের নাটক করার ব্যাপারে তাঁর সায় আছে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও আছে। কেন আছে এই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। একদিন তিনি মেয়ের অভিনয়ও দেখে এলেন। মেয়েকে শুধু বললেন, 'ছেলেটার গায়ের উপর এমন লেপ্টে পড়ে যাওয়ার দরকার কি? একটু দূরে-দূরে থাক।'

পুষ্প বলেছে, 'আচ্ছা।'

মমতা বলেছেন, 'যখন ছেলেটা হাত ধরবে, তখন হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি। যে বউয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি বই লেখে—তার সঙ্গে এত কি মাখামাখি?

বুঝলি, হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি।'

পুষ্প হেসে বলেছে, 'আচ্ছা।'

'তোর স্বামী হয়েছে যে, ঐ ছেলেটা কে?'

'তার নাম আসিফ।'

'বিয়ে করেছে?'

'হুঁ।'

'বউকে তো দেখলাম না।'

'উনি এখন আসেন না। শরীর ভালো না।'

'দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দরী। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।'

ছেলেটির স্ত্রী খুবই সুন্দরী, এটা শোনার পর মমতার দুশ্চিন্তা পুরোপুরি চলে যায়। থিয়েটারের লোকগুলোকে তাঁর ভালোই লাগে। বিশেষ করে মেয়েগুলোকে। এর মধ্যে এক জন—যে মায়ের ভূমিকা করে তাঁকে তাঁর খুবই মনে ধরল। দেখেই মনে হয় শক্ত ধরনের মহিলা। এরকম শক্ত ধরনের মহিলা থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মমতা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন। মহিলাকে বললেন, 'আমার মেয়েটাকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।' সেই মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'সে কি, আপনার মেয়ে তো আমারও মেয়ে।' মমতা বড় শান্তি পেলেন।

পুষ্প যে পরিবার থেকে এসেছে, সেই পরিবারের সদস্যরা কোনো কিছু নিয়েই তেমন মাথা ঘামায় না। এতগুলো ছেলেমেয়ে যেখানে বড় হয় সেখানে কারো উপর তেমনভাবে নজর রাখা যায় না। কেউ অন্যায় কিছু করলেও তা মনে থাকে না। এজাজুদ্দিন সাহেব একদিন দেখলেন এ বাড়ির এক জন ছেলে রাস্তায় পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এলেন। অপরাধী কে তা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। কে ছিল? বাবলু না মহিন? অনেকক্ষণ হৈ-চৈ করার পর তাঁর রাগ কমল।

পুষ্প হৈ-চৈ কান্নাকাটি করে থিয়েটারে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমে ব্যাপারটায় সবার খুব আপত্তি থাকলেও, এখন মনে হচ্ছে কারোর মনেই নেই। পুষ্পর চাচা একদিন রাতে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কোথেকে আসছিস?'

পুষ্প বলল, 'থিয়েটার থেকে।'

'থিয়েটার! কিসের থিয়েটার?'

'ভুলে গেছেন চাচা? আমি একটা নাটক করছি না?'

'নাটক, কবে?'

'সামনের মাসে।'

'ও আচ্ছা-আচ্ছা। রাত-বিরাতে ফিরতে হয় নাকি? এটা তো ভালো কথা না। দশটা বাজে। দশটা পর্যন্ত নাটক করলে পড়বি কখন?'

'এই নাটকটা করে আর করব না চাচা।'

'গুড। ভেরি গুড।'

রিহার্সেল থেকে পুষ্প সব সময় হাসিখুশি হয়ে ফেরে। আজ তার মুখটা কালো।

যেন বিরাট কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ রিহার্সেলে তার সময়টা খুব ভালো কেটেছে। আজমল নামের এক জন ভারিক্কি ধরনের লোক তাকে অনেক মজার-মজার কথা বলেছে। সেই সব কথার মধ্যে একটা হচ্ছে, 'এই মেয়ে, ফস করে কাউকে বিয়ে করে বসবে না। তাহলে নাটক মাথায় উঠবে। তোমার অভিনয় খুব ভালো হচ্ছে। কিছুদিন পর দেখবে পথে বের হতে পারবে না। অটোগ্রাফ-অটোগ্রাফ বলে লোকজন মাথা খারাপ করে দেবে। অটোগ্রাফ কী করে দিতে হয় সেটাও শিখে নাও। খুব সহজ একটা সিগনেচার তৈরি কর, যাতে খুব দ্রুত অটোগ্রাফ দিতে পার। কালো চশমা পরা অভ্যেস করতে হবে। যাতে লোকজন চট করে চিনতে না পারে।'

লীনা আপাও তার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। গায়ে হাত রেখে এত আন্তরিকভাবে কথা বললেন যে, তার চোখ প্রায় ভিজে উঠল। রিহার্সেল পুরোপুরি শেষ হবার পর সবাই মিলে যখন চা খাচ্ছে তখন তাকে বললেন, 'তোমার জন্যে কি কিছু আনতে হবে পুষ্প? আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি। তোমার পছন্দের কোনো জিনিস যদি থাকে তাহলে বল। আমি অবশ্যই নিয়ে আসব। তবে খুব দামি কিছু আনতে বলবে না। আমার হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই।'

পুষ্প বলল, 'আমার জন্যে চন্দন কাঠের একটা পুতুল আনবেন।'

'অবশ্যই আনব।'

'আপনি কতদিন থাকবেন?'

'শুরুতে কথা হয়েছিল দশ দিনের। এখন শুনছি এক মাসের প্রোগ্রাম হচ্ছে। তবে আমি এতদিন থাকব না। তোমাদের নাটকের আগে অবশ্যই ফিরে আসব।'

পুষ্প বলল, 'নাটক আপনাদের খুব প্রিয়?'

'হ্যাঁ প্রিয়। খুবই প্রিয়। নাটকের একটা দল মানে—পরিবারের বাইরে একটা পরিবার।'

পুষ্প চুপ করে রইল।

লীনা বলল, 'কিছুদিন যাক, তখন তুমিও এটা বুঝবে। সবাই কিছুদিন পর-পর একসঙ্গে হতে না পারলে দেখবে ভালো লাগছে না। অস্থির-অস্থির লাগছে। গ্রুপ নাটকের কত সমস্যা, তার পরেও যে গ্রুপ নাটক টিকে আছে—কেন আছে? এই কারণেই আছে।'

বিদায় নেবার সময় লীনা আপা তার দিকে তাকিয়ে এমন মিষ্টি করে হাসল, তবু তার অসম্ভব মন খারাপ হল। কারণটা খুব অদ্ভুত।

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। তারা সবাই বারান্দায়। জলিল ভাই বললেন, 'সবাইকে আমি গাড়িতে পৌঁছে দেব। দরকার হলে দু'ট্রিপ দেব। নো প্রবলেম। সবাই তাতে খুশি। আর আশ্চর্য, আসিফ ভাই বলল, 'আমাদের পৌঁছে দিতে হবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রিকশায় করে যাওয়ার অন্যরকম আনন্দ আছে। কাজেই শুভ রাত্রি।'

তারা সত্যি-সত্যি রাস্তায় নামল। আসিফ ভাই লীনা আপার হাত ধরে হাঁটছেন। বৃষ্টির মধ্যে দু'জন নেমে যাচ্ছে।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! প্রথম কয়েক মুহূর্ত পুষ্পের মন আনন্দে পূর্ণ হল। তার পর-পরই চোখে পানি এসে পড়ার মতো কষ্ট হতে লাগল।

কেন তার কষ্ট হচ্ছে এটা সে জানে। কিন্তু তার বিশ্বাস করতে মন চাচ্ছে না। তার

কষ্টের কারণটা সে জানে, অথচ কাউকে সে বলতে পারবে না—এও একটা বিরাট কষ্ট। ভালো এক জন বন্ধু যদি তার থাকত, তাহলে কি সে তাকে এটা বলতে পারত? না পারত না। কোনোদিন কাউকে এটা বলা যাবে না। চিরকাল গোপন রাখার মতো কিছু কিছু ঘটনা সব মানুষের জীবনেই হয়ত ঘটে। বাইরের কেউ কোনোদিন তা জানতে পারে না। বড়চাচার মেয়ে মিতুরও একটা গোপন কথা আছে, যা সে কাউকে বলতে পারবে না। শুধু পুষ্পকে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'একটা গোপন কথা তোকে বলব। কাউকে না বলতে পারলে আমি মরে যাব।'

পুষ্প বলল, 'কী?'

মিতু বলল, 'কিছু না, এম্নি ঠাট্টা করছি।' বলতে বলতে আবার কেঁদে অস্থির হল। মিতুর গোপন কথা পুষ্প জানে না। মিতু বলে নি। কাউকে হয়ত সে আর বলবে না। গোপন কথা গোপনই থেকে যাবে।

পুষ্প বাড়িতে ঢুকে শান্ত ভঙ্গিতে হাত-মুখ ধুয়ে মাকে গিয়ে বলল, 'ভাত দাও মা।'

মমতা বললেন, 'তোর কী হয়েছে রে? এমন লাগছে কেন?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে। খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

'তোর চাচীর ওখানে গিয়ে খেয়ে আয়। ডাল ছাড়া ঘরে আর কিছু খাবার নেই।'

'ডাল দিয়েই খাব। ও ঘরে এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না।'

মমতা উঠে গিয়ে রান্নাঘরেই মেয়েকে ভাত বেড়ে দিলেন। পুষ্প বলল, 'তুমি খাবে না মা?'

মমতা বললেন, 'বুকে অম্বলের ব্যথা উঠেছে, এক কাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। তোকে একটা ডিম ভেজে দেই।'

'দাও।'

মমতা ডিম ভাজতে ভাজতে বললেন, 'আজ এক কাণ্ড হয়েছে—সন্ধ্যাবেলা একটা গাড়ি করে দু'তিন জন মহিলা এসে উপস্থিত। কাউকে চিনি না। বললাম—কাকে চান?'

'মোটামতো একজন মহিলা বললেন, আমরা আপনার প্রতিবেশী, বেড়াতে এসেছি। আমার তখনি সন্দেহ হল। প্রতিবেশী হলে গাড়ি করে আসবে কেন? কেমন অস্বস্তি-অস্বস্তি ভাব। হেন তেন নানান কথার পর ফস করে বলল, আপনার বড় মেয়েটার কি বিয়ে দেবেন? চিন্তা কর অবস্থা। চিনি না জানি না এসেই বলে কি- না—বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন?'

পুষ্প বলল, 'তুমি কী বললে?'

'আমি আবার কী বলব? আমি বললাম, জ্বি না। মেয়ের বিয়ের কথা এখনো ভাবছি না। ওমা, তার পরেও যায় না। বসেই আছে।'

পুষ্প বলল, 'চুপ কর তো মা। শুনতে ভালো লাগছে না।'

'আহা, আসল মজাটা তো শুনলি না। খুব ফর্সা করে এক জন মহিলা আছেন, উনি বললেন—বিয়ের সম্পর্ক এলে মুখের উপর না বলতে নেই আপা। প্রপোজাল শুনুন, তারপর বলুন না।'

'আমি বললাম, এম. এ পাশ করার আগে মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ে দেবে না।

ভদ্রমহিলা বললেন, এম. এ পাশ তো বিয়ের পরেও করতে পারে। কী যে যন্ত্রণা। কিছুতেই যাবে না।'

'তারপর বিদেয় করলে কী ভাবে?'

'শেষ পর্যন্ত বললাম, আপা, আমাদের এক জায়গায় যাবার কথা আছে। তারপর উঠল।'

পুষ্প বলল, 'তোমার মজার কথা শেষ হয়েছে, না আরো বাকি আছে?'

'আসলটাই তো বলা হয় নি। ওরা চলে গেলে দেখি টেবিলের উপর চশমা পরা একটা ছেলের ছবি। ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। মিতুর কাছে ছবিটা আছে। দেখতে চাইলে ওকে বল।'

'আমি কেন দেখতে চাইব?'

'আহা রেগে যাচ্ছিস কেন? দেখতে না চাইলে দেখবি না। নাটক থিয়েটার করতে পারিস, একটা ছেলের ছবি দেখলে তোর মান যাবে নাকি?'

'নাটক থিয়েটার আমি আর করব না।'

'কী বললি?'

'নাটক আমি আর করব না।'

'হঠাৎ কী হল?'

'আমার ভালো লাগছে না।'

পুষ্প উঠে চলে গেল। সে রাতে মিতুর সঙ্গে শোয়। আজ নিশ্চয়ই দেশের বাড়ি থেকে কেউ এসেছে। চিড়িয়াখানা দেখবে কিংবা চিকিৎসা করাবে। কারণ মিতুর বিছানায় অপরিচিত এক জন মহিলা ঘুমুচ্ছেন। মিতুও তার স্বভাব মতো হাত পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। পুষ্প তার নিজের শোবার জায়গা খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হল না। ভেতরের দিকের বারান্দায় চলে গেল। রেলিং দেয়া বারান্দার এক কোণে একটা ইজিচেয়ার। পুষ্পর বাবা এই চেয়ারে বসে রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়েন। রাতে চেয়ারটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ নেয়া হয় নি।

পুষ্প চেয়ারে এসে বসল। বৃষ্টি হচ্ছে না। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকা মানে বাকি রাতটায় আর বৃষ্টি হবে না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ উঠবে। চাঁদ উঠলে পুষ্পদের বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ভেতরের উঠোনে দুটো প্রকাণ্ড কামিনী গাছ আছে। সেই গাছে চাঁদের আলো পড়ে। বড়ই রহস্যময় লাগে।

পুষ্প চুপচাপ বসে আছে। বসে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার একটা স্বপ্নও দেখল। এই স্বপ্নটি বড় মধুর ছিল, তবু সে ঘুমের মধ্যেই খুব কাঁদল।

৯

খুব ভোরে লীনার ঘুম ভাঙল। এই ভোরগুলোকেই বোধ হয় কাকভোর বলে। তারস্বরে কাক ডাকছে। ঘরের ভেতর আঁধার ও আলো। সেই আলো-অন্ধকারে মিশে পৃথিবীটাকে অন্যরকম করে রেখেছে। শহরের ভোরে পাখির ডাক শোনা যায় না।

কর্কশ কাক ডাকে। কাককে তো আর কেউ পাখি ভাবে না।

আসিফ পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। একটা হাত মুখের উপর ফেলে রাখায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। লীনার একবার ইচ্ছা করল, আসিফকে ডেকে তোলে। এত আরাম করে সে ঘুমুচ্ছে যে ডাকতে ইচ্ছা করল না। লীনা দরজা খুলে বাইরে এল। রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। বেনু তার বাচ্চার জন্যে দুধ গরম করছে। লীনা রান্নাঘরে ঢুকল। চায়ের পানি চড়াবে। অনেকদিন বেড–টি খাওয়া হয় না।

বেনু মুখ তুলে লীনাকে দেখল। কিছু বলল না। বেনুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। লীনা বলল, 'বাচ্চা জেগে গেছে?'

'জ্বি।'

'চা খাবে বেনু? আমি চা করছি।'

'চা খাব না। আজ আপনি চলে যাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ লাগে?'

'একটু লাগে। তোমারও কি মন খারাপ? কেমন যেন লাগছে। ঝগড়া–টগড়া হয়েছে?'

বেনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনটা খুব খারাপ। খুকির বাবা কাল রাতে আমাকে চড় দিয়েছে। নিজের বাবা–মা কোনোদিন আমার গায়ে হাত তুলে নাই। আর ও কি না. . . ।'

বেনুর বাচ্চা কাঁদছে। সে দুধ নিয়ে চলে গেল। লীনাকে সুন্দর ভোরবেলায় অসুন্দর একটি ছবির মুখোমুখি হতে হল। বেচারা বেনু। আজ সারাদিন খুব মন খারাপ করে থাকবে।

আগামীকাল বা পরশুও এরকম যাবে। তারপর আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। স্বামীর সঙ্গে হাসবে, গল্প করবে। স্বামীর প্রয়োজনে লাজুক ভঙ্গিতে ব্লাউজের হুক খুলবে। তারপর আবার একদিন এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবে। স্বামী চড় বসাবে কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে মেঝেতে।

লীনা দু'কাপ চা বানিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। আসিফ একটা চাদর টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। বেচারার বোধ হয় শীত করছিল। ডেকে তুলে চা খেতে বলবে? না থাক, বেচারা ঘুমুক। যদিও ডেকে তুললেই ভালো হত। আজ লীনা চলে যাবে। যাবার দিনটায় যত বেশি পারা যায় গল্প করা উচিত।

লীনা আসিফের পাশে বসে চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে হঠাৎ তার মনে হল—তাদের দু' জনের সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। আসিফ কখনো কোনো কারণেই তার সঙ্গে রাগ করে নি। চড়া গলায় কথা বলে নি। লীনা নিজে কোনো মহামানবী নয়। আসিফের রাগ করার মতো এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অনেক কিছুই সে করেছে। অথচ সে সব যেন আসিফকে স্পর্শই করে নি। এর কারণটা কি? এও কি এক ধরনের অভিনয় নয়?

একজন বড়ো মাপের অভিনেতা কি সব সময়ই অভিনয় করে না? এক জন দক্ষ, শুধু দক্ষ নয়—অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতা নিজেকে সব সময় দখলে রাখেন। সারাক্ষণ অভিনয় করে যান।

অভিনয় সব মানুষই করে। যে স্ত্রীকে অসহ্য বোধ হয়, তার সঙ্গেও সে হাসি মুখে কথা বলে। অভিনেতা সেই জিনিসটাকেই অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যান।

লীনা অস্বস্তি বোধ করছে। আসিফ সম্পর্কে এ রকম ধারণা তার শুধু আজ না, অনেকবারই হয়েছে। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে সন্দেহটা তার প্রথম হল। সে লক্ষ করল ভালবাসাবাসির সময় আসিফ একেক সময় একেক রকম আচরণ করে। যেন সে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। একজন মানুষ ভিন্ন–ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন–ভিন্ন আচরণ করতে পারে, কিন্তু তার মূল সুরটি কিছুতেই কাটবে না। মূল সুর অবশ্যই বজায় থাকবে। আসিফের বেলায় তা থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই তার বেলায় বদলে যায়। অভিনয় ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়।

লীনা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একটা হাত আসিফের গায়ে রাখল। মৃদু স্বরে ডাকল, 'এ্যাই।'

আসিফ সঙ্গে–সঙ্গে জেগে উঠল। লীনা বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে আস, চা গরম করে আনছি।'

'আরেকটু ঘুমুতে ইচ্ছা করছে যে।'

'তাহলে ঘুমাও।'

লীনা আবার বারান্দায় চলে এল। যদিও সে জানে, আসিফ ঘুমুবে না, উঠে আসবে। সে ঠিক তাই করবে যা এক জন আদর্শ স্বামীর করা উচিত। এর বাইরে সে একচুলও যাবে না।

আসিফ সত্যি–সত্যি উঠে এল। বাথরুম থেকে হাত–মুখ ধুয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'এ তো মনে হচ্ছে একেবারে প্রত্যূষ লগ্ন।'

লীনা বলল, 'তুমি কি বেরুবে নাকি আজ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'বৃটিশ কাউন্সিলে যাব। এগারটার সময় একটা ছোটখাট ওয়ার্কসপের মতো হবে। বৃটিশ এক জন মহিলা নাটকের বিশেষজ্ঞ এসেছেন। নাটক নিয়ে কথা বলবেন, শুনে আসি। তুমি যাবে?'

'না।'

'তোমার প্লেন তো রাতে। চল না যাই।'

লীনা জবাব না দিয়ে চা আনতে গেল।

পাশের ঘরে উঁচু গলায় হাশমত আলি চিৎকার করছে, 'তুই পেয়েছিস কী? তুই ভাবস কী? তুই কি ইয়ার্কি করস? তুই আমারে চিনস না?'

গ্রাম্য ভাষা, কুৎসিত ভঙ্গির চেঁচামেচি। বেনুর গলা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। লীনা লক্ষ করল, আসিফ খুব আগ্রহ নিয়ে ঝগড়ার কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে। এই আগ্রহ অশোভন। অন্যদের কুৎসিত চেঁচামেচি সে এত আগ্রহ নিয়ে শুনবে কেন? লীনা রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। তার মনে হল—ঝগড়াটা আসিফের শোনা উচিত। এক জন অভিনেতাকে চারপাশ থেকে শিখতে হবে। ক্যারেক্টর এ্যানালাইসিস করতে হবে। ঝগড়ার সময় কোন পর্দায় চেঁচাবে, কোন ভঙ্গিতে কথা বলবে, মুখের কোন মাংসপেশী ফুলে–ফুলে উঠবে, ভুরু কোঁচকাবে কি

কোঁচকাবে না, এসব লক্ষ না করতে পারলে বড় হবার পথ কোথায়?

লীনা চা এনে দিল। আসিফ চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির ভঙ্গি করল। লীনা বলল, 'হাশমত সাহেবের চেঁচামেচি শুনতে কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং। একটা জিনিস লক্ষ করলাম—ঝগড়ার সময় বা প্রচণ্ড রাগের সময় মানুষের গলায় কোনো রকম ভেরিয়েশন থাকে না। এক স্কেলে সে কথা বলে, এবং বলে অতি দ্রুত। আমার ধারণা, তার কথা বলার স্পিড তখন তিনগুণ বেড়ে যায়।'

লীনা ক্লান্ত গলায় বলল, 'তুমি দয়া করে হাশমত সাহেবকে বল তো চুপ করার জন্যে। এই ভোরবেলায় উনি কী শুরু করেছেন? খুব খারাপ লাগছে।'

আসিফ সঙ্গে–সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে চলে গেল। ভারি এবং গম্ভীর গলায় ডাকল, 'হাশমত সাহেব, এই যে হাশমত সাহেব।'

'জ্বি।'

'একটু বাইরে আসুন তো ভাই।'

'কেন?'

'আসুন। আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খান।'

হাশমত সাহেব বিরক্ত মুখে বের হয়ে এলেন, ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'অসহ্য, বুঝলেন ভাই। অসহ্য, কানের কাছে রাতদিন ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানঘ্যান। লাইফ হেল করে দিয়েছে।'

'তাই বুঝি?'

'আর বলেন কেন ভাই। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে।'

'মাঝে–মাঝে মাথায় রক্ত ওঠা ভালো। এতে ব্রেইন পরিষ্কার থাকে।' বলতে– বলতে আসিফ হাশমত সাহেবের কাঁধে হাত রেখে হাসল। লীনা দূর থেকে লক্ষ করল, এই হাসি শুধু হাসি নয়, এর মধ্যে অনেকখানি অভিনয় মিশে আছে। এই হাসি দিয়েই আসিফ অনেক কিছু বলতে চাচ্ছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে সংসারে অবুঝ মেয়েরা থাকে। তারা অনেক অন্যায় করে। এইসব অন্যায় দেখতে হয় ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের চোখে। সব কিছু ধরতে নেই।

'নিন হাশমত সাহেব। একটা সিগারেট ধরান, তারপর এই চমৎকার সকালটা একটু দেখুন।'

'আর ভাই সকাল। রাতে ঘুমাতে দেয় নাই। খালি ফ্যাঁচ–ফ্যাঁচ।'

আসিফ আবার হাসল। নিজেই সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। ভাবিকে ডেকে বলুন তো, আমাদের দু'জনকে দু'কাপ চা দিতে। এরকম ভোরবেলায় রাগারাগি করা ঠিক হচ্ছে না। রাগারাগিটা রাতের জন্য মুলতবি থাক। রাতে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবেন।'

হাশমত আলি সত্যি–সত্যি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ও বেনু, দেখি আমাদের চা দাও তো। নোনতা বিসকিট কিছু আছে কিনা দেখ। আমার আবার খালি পেটে চা সহ্য হয় না।'

বেনু চোখ মুছে চা বানাতে গেল।

আসিফ বলল, 'বুঝলেন হাশমত সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি ভোর নিয়ে একটা কবিতা মনে করতে। মনে করতে পারছি না। বাঙালি কবিরা ভোর নিয়ে বেশি

কবিতা লেখেন নি বলে মনে হচ্ছে।'

'লিখবে কোত্থেকে বলেন? কয়টা কবি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে? এরা রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জাগে, ওঠে সকাল দশটার পর।'

আসিফ শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসি ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির চেয়েও সংক্রামক। হাশমত আলিও হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ভোরের একটা কবিতা মনে পড়ছে রে ভাই—ভোর হল দোর খোল. . . হা হা হা।'

বেনু চা নিয়ে এসেছে। হাশমত বলল, 'বেনু, আসিফ ভাইকে বলেছ—যে ক'দিন ভাবি থাকবে না দু'বেলা আমাদের সঙ্গে খাবে। না খেলে আমরা খুবই মাইন্ড করব। ভালো করে বলে দাও।'

'ভাইজান কি আমার কথা শুনব?'

'অফকোর্স শুনবে। আমরা থাকতে বাইরে খাবে, এটা কি কথা। ভাইসাবের উপলক্ষে ভালো-মন্দ কিছু খাব। বেনু, জিরা বাটা দিয়ে তুমি যে গোশত রাঁধ, এইটা রাঁধবে মনে কর।'

আসিফের বড় ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ আগে কী কুৎসিত চেঁচামেচি হচ্ছিল। এখন কী চমৎকার করেই না দু'জন কথা বলছে। এরা দু'জন ভোরের আনন্দ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লীনা কাপড় গোছাচ্ছে। ঠিক হয়েছে, আসিফ বৃটিশ কাউন্সিলে যাবার পথে লীনার মার বাড়িতে তাকে রেখে আসবে।

লীনা বলল, 'তুমি আবার এয়ারপোর্ট উপস্থিত হয়ো না।'

'কেন?'

'তুমি একা থাকবে, আমি চলে যাব—ভাবতেই খারাপ লাগছে। শেষে কেঁদে-টেদে ফেলব। দুলাভাই এটা নিয়ে সারাজীবন ঠাট্টা করবেন। কেউ তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমার ভালো লাগে না।'

আসিফ বলল, 'তোমার প্লেন তো সেই রাতে। সারাদিন তোমার মার বাসায় কী করবে? তার চেয়ে চল, ঐ বৃটিশ মহিলা কী বলেন শুনি। অনেক শেখার ব্যাপার থাকতে পারে।'

'শেখার ব্যাপার থাকলে তুমি শেখ। আমার আর কিছু শিখতে ইচ্ছা করছে না।'

আসিফ ইতস্তত করে বলল, 'তোমার সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারলাম না। কিছু মনে কর না লীনা। যা দরকার লাগে, তুমি তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে নিও, আমি পরে ব্যবস্থা করব।'

লীনা বলল, 'সঙ্গে যা আছে, যথেষ্টই আছে। ঐ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে কী আনব বল।'

'একটা কাজ করা পাঞ্জাবি আর জয়পুরী স্যান্ডেল।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'নাটকের উপর বইপত্র যদি কিছু পাই, আনব না?'

'অবশ্যই আনবে।'

লীনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। আসিফ বলল, 'হাসছ কেন?'

'এম্নি হাসছি। এটা যদি অভিনয়ের দৃশ্য হত, তাহলে বোধ হয় হাসাটা ঠিক হত না। তাই না?'

'কী বলছ তুমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আজ ভোর থেকে মাথার মধ্যে শুধু আবোল-তাবোল চিন্তা ঢুকছে। দেশের বাইরে যাচ্ছি, সে জন্যেই বোধ হয়। দেশের বাইরে তো কখনো যাই নি।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'শরীর ঠিক আছে।'

'তুমি কেন জানি আজ অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর হয়ে আছ। কী ব্যাপার লীনা?'

লীনা বলল, 'একটু অপেক্ষা কর। ব্যাগটা গুছিয়ে নিই, তারপর হাসি মুখে তোমার সঙ্গে গল্প করব। তুমি চাইলে জানালা বন্ধ করে, দরজার পর্দা ফেলে ঘর একটু আঁধার করে নেব। তারপর দু'জনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুঃখী, আঁধারে ঢাকিয়া গেছে আর সব।'

আসিফ তাকিয়ে আছে। লীনা হাসছে তরল ভঙ্গিতে।

১০

বৃটিশ মহিলার বক্তৃতা আসিফের মোটেই ভালো লাগল না। প্রথমত কথা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রতিটি শব্দ তিনি খানিকক্ষণ চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে বলছেন। যা বলছেন, তার সঙ্গে অভিনয়ের যোগ তেমন নেই বলেই আসিফের ধারণা। ভদ্রমহিলা বলছেন স্টেজের ব্যাকগ্রাউন্ডের আলো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের সমন্বয় বিষয়ে। সবটাই মনে হচ্ছে কচকচানি থিওরি। সিমিট্রি রেখে কী করে সিমিট্রি ভাঙতে হবে, এই সব বিষয়। ডায়নামিক ড্রামা এবং স্ট্যাটিক ড্রামার সঙ্গে আলো এবং শব্দের সম্পর্ক। এক পর্যায়ে ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকবোর্ডে হাবিজাবি ইকোয়েশন লিখতে শুরু করলেন।

আসিফের পাশে লিটল ঢাকা গ্রুপের মন্তাজ সাহেব বসেছিলেন। তিনি নিতান্ত বিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে বললেন, 'এই হারামজাদী তো মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল। এ তো দেখি অঙ্ক করছে!'

আসিফের কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা বোগাস বলেই মনে হচ্ছে। উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সে বসেছে মাঝামাঝি জায়গায়, এখান থেকে চলে যাওয়া মুশকিল। এক জন উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে খড়খড়ে গলায় বললেন, 'আমি কি আমার কথায় আপনাকে আকৃষ্ট করতে পারছি না? কথায় না পারলেও রূপে তো আপনাকে আটকে ফেলার কথা। আমি কি যথেষ্ট রূপবতী নই?'

চারদিকে তুমুল হাসির মধ্যে ভদ্রলোককে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে পড়তে হল। এ রকম অবস্থায় হলঘর ছেড়ে উঠে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রমহিলার বক্তৃতার প্রথম

পর্ব শেষ হল এক ঘন্টা পর। আসিফের কাছে মনে হল, সে অনন্তকাল ধরে এই চেয়ারে বসে আছে। বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্ব শোনার মতো মনের জোর পাচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দ্বিতীয় পর্ব হল অসাধারণ। ভদ্র মহিলা কিছু ছবি বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। অভিনয় অংশ প্রতিটিতেই এক। হুবহু এক, কিন্তু আলো এবং শব্দের মিশ্রণ একেকটা একেক রকম। শুধু এই কারণে কেমন বদলে যাচ্ছে—অর্থ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা ছবি দেখাতে দেখাতে ভদ্রমহিলা ব্যাখ্যা করছেন

'দেখুন, নাটক শুরু হয় গীর্জায়। ধর্মযাজকরা গীর্জায় নাটকের মাধ্যমে লোকদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। তার মানে এই নয় যে, নাটক ব্যাপারটায় ঐশ্বরিক কিছু আছে। কিছুই নেই। নাটকের মাধ্যমে আমরা মানুষের মনে আবেগ তৈরি করি। নাটকের গবেষকরা এখন কাজ করছেন আবেগ তৈরির মেকানিজম নিয়ে। নাটক তার রহস্যময়তা হারাতে বসেছে। এখন আমরা আবেগের ব্যাপারটা বিজ্ঞানের চোখে দেখতে শুরু করেছি। বিজ্ঞানের কাছে হৃদয় কিন্তু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।'

আসিফ মুগ্ধ হয়ে গেল। বারবার মনে হল, লীনা পাশে থাকলে চমৎকার হত। একটা চমৎকার জিনিস বেচারি 'মিস' করল। আসিফের খুব ইচ্ছা করছিল ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে—আধুনিক কালের নাটকে কি অভিনেতা-অভিনেত্রীর গুরুত্ব কমে আসবে?

গুছিয়ে ইংরেজিটা তৈরি করতে পারল না বলে জিজ্ঞেস করতে পারল না। লিটল ঢাকার মন্তাজ সাহেব বলতে বাধ্য হলেন, 'শালী জানে ভালোই! শেষ দৃশ্যে এসে শালী জমিয়ে দিয়েছে। কী বলেন আসিফ সাহেব?'

আসিফ কিছু বলল না। তার মনে এক ধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কথা বলে এই মুগ্ধতা সে নষ্ট করতে চায় না।

সারাদিনেও তার মুগ্ধতা কাটল না। কানে বাজতে লাগল রূপবতী মহিলার চমৎকার ব্যাখ্যা। একের পর এক যুক্তির ইট বিছিয়ে বিশাল ইমারত তৈরি করা।

'অবশ্যি মাঝে-মাঝে এইসব যুক্তিতে ভুল থাকে। ভুল যুক্তির ইটে বিশাল ইমারতও তৈরি হয়। এক সময় সেই ভুল ধরা পড়ে। সুবিশাল প্রাসাদ মুহূর্তে ধসে যায়।

আসিফের সারাদিন কিছুই করার ছিল না। অনেক দিন পর দুপুরে টানা ঘুম দিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হল লীনার সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করে এলে কেমন হয়। এই চিন্তাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। লীনার কাছে যাওয়া মানেই এমন অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়া, যাদের সঙ্গ তার ভালো লাগে না। তারচে লীনা নেই, এই ধরনের বিরহ ভালো লাগছে।

বেনু যত্নের চূড়ান্ত করছে। দুপুরে সাত-আট পদের রান্না করেছে। এর মধ্যে জিরা-মাংসও ছিল। খেতে মোটেই ভালো হয় নি, তবু আসিফ যখন বলল, 'বাহ্, এরকম কখনো খাই নি তো!' এতেই বেনুর চোখে পানি এসে গেল। বড় ভালো লাগল আসিফের।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসবার আগেই বেনু এসে উপস্থিত। ট্রেতে করে চা-লুচি

হালুয়া নিয়ে এসেছে। তার মুখ হাসি-হাসি। তাকে দেখে কে বলবে এই মেয়ে সকালে কেঁদে-কেটে কী কাণ্ড করেছে।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বেনু বলল, 'এইবার আপনাদের নাটক দেখব ভাইজান।'

'অবশ্যই দেখবেন। আমি নিয়ে যাব।'

'আপনাকে কতবার বলছি ভাইজান, আমারে তুমি করে বলবেন। আপনারে আমি বড় ভাইয়ের মতো দেখি।'

'আচ্ছা বলব। তোমাদের ঝগড়া মিটে গেছে?'

বেনু জবাব দিল না। লজ্জিত মুখে হাসল।

'লুচিটা গরম-গরম ভাজছি ভাইজান। একটু খান।'

'পেটে একদম জায়গা নেই।'

'কিচ্ছু হবে না ভাইজান, খান। একটা খান। একটা লুচিতে কী হয়? কিছু হয় না।'

সন্ধ্যা মেলাবার পরপরই আসিফ রিহার্সেলে উপস্থিত হল। আজ একটা ফুল রিহার্সেল হবার কথা। কাঁটায়-কাঁটায় সাতটায় রিহার্সেল শুরু হবে, এ রকম কথা।

আসিফ দেখল সবাই প্রায় এসে গেছে। সবার মুখই বেশ গম্ভীর। বজলু বললেন, 'বিরাট প্রবলেম হয়েছে আসিফ।'

'কী প্রবলেম?'

'ঐ মেয়েকে নিয়ে প্রবলেম। পুষ্প।'

'কী প্রবলেম?'

'মেয়ে জানিয়েছে অভিনয় করবে না।'

'সে কি!'

'এইসব চেংড়ি-ফেংড়ি নিয়ে এখন তো দেখছি গভীর সমুদ্রে পড়লাম। কী করা যায় বল তো?'

'অভিনয় করবে না কেন?'

"তাও তো জানি না। মীনা ফিরে আসার পর আমি নিজেই গেলাম, বুঝলে—আমরা যেমন অবাক, ওদের বাসার লোকজনও অবাক। আমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা, বুঝলে। আমার অবস্থা দেখে পুষ্পের বাবা নিজেই বললেন, 'শেষ সময়ে তুমি তাদের অসুবিধায় ফেলছ, এটা তো ঠিক না। অন্যায়। খুবই অন্যায়।"

'পুষ্প কী বলল?'

'কিছুই বলে না। মাথাটা বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেই বলে—না। আমার ইচ্ছা করছিল চড় দিয়ে বাঁদীর নখরামী ঘুচিয়ে দিই।'

বজলু রাগে চিড়বিড় করতে লাগলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে বারান্দায় আস তো। আড়ালে তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলব।'

আসিফ বারান্দায় গেল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'তুমি একবার যাও। তুমি গেলে আসবে।'

'আমি গেলে আসবে কেন?'

'তুমি গেলে সে কেন আসবে সেটা তুমি নিজেও জান, আমিও জানি। খামোখা

কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? তুমি তাকে নিয়ে আস—তারপর এই শোটা পার হলে মেয়েটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেই হবে। এই যন্ত্রণাটা পার হোক। যাও, জলিলের গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে যাও।'

'আজ থাক। আরেক দিন যাব।'

'আজই যাও। এটা ফেলে রাখার ব্যাপার না। তুমি এক্ষুনি যাও।'

'যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'ঠিক হবে না বেঠিক হবে এটা নিয়ে পরে বিচার-বিবেচনা করা যাবে। তুমি কথা বাড়িও না, যাও।'

পুষ্পের বাবা আসিফকে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি দেখি মেয়েকে আনা যায় কি না। সে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। মেয়েকে অভিনয় করতে পাঠিয়েও এক যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম।'

আসিফ বলল, 'আমি খুব লজ্জিত, আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম। অবস্থা এমন যে, পুষ্প না এলে আমাদের নাটক বন্ধ করে দিতে হবে। চালিয়ে নিতে পারে, এ রকম দ্বিতীয় কেউ নেই।'

'বসুন চা খান। দেখি কী করা যায়।'

চিনি দিয়ে সরবত করে ফেলা এক কাপ ঠাণ্ডা চা আসিফ শেষ করল। পুষ্পের দেখা নেই। এক সময় পুষ্পের বাবা এসে শুকনো গলায় বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মেয়ে দরজাই খুলছে না।'

আসিফ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি কি একবার বলে দেখব? যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।'

পুষ্পের বাবা বললেন, 'যান বলে দেখুন। রুমি, ওনাকে দোতলায় নিয়ে যা।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসিফ বলল, 'পুষ্প, দরজা খোল।'

পুষ্প সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে বলল, 'আপনি এসেছেন? আপনি নিজে এসেছেন? কি আশ্চর্য, আমাকে তো কেউ বলে নি আপনি এসেছেন!'

'তুমি অভিনয় করবে না পুষ্প?'

পুষ্প ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আপনি যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'তাহলে মুখটা ধুয়ে নাও। চল আমার সঙ্গে।'

গাড়িতে পুষ্প সারাক্ষণই কাঁদল। একবার শুধু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি কি আপনার হাতটা একটু ধরব?'

আসিফ বলল, 'অবশ্যই। কেন ধরবে না?'

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিহার্সেল হল। ফুল রিহার্সেল, প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য। বজলু সাহেব হৃষ্ট চিত্তে বললেন, 'জিনিস মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের কী ধারণা?'

প্রণব বাবু বললেন, 'শেষ দৃশ্য আমার কাছে একটু লাউড মনে হয়েছে।'

'লাউড তো বটেই। এটার প্রয়োজন আছে। আর কারো কোনো কথা আছে? থাকলে বল। ফ্রি ডিসকাশন হোক। আমার মন বলছে, একটা ভালো জিনিস দাঁড়া

হয়েছে। তবে আমার ধারণা, থার্ড সিন স্লো হয়েছে।'

'থার্ড সিন তো স্লোই হবে।'

'এতটা হবে না। ডেলিভারিতে এতটা সময় খাওয়ার কিছু নেই। এক জন স্লো করবে, এক জন করবে ফাস্ট। দু' জনই স্লো করলে হবে না। ভেরিয়েশন দরকার।'

'আমার মতে থার্ড সিন ঠিকই আছে।'

'অন্য সবারও কি তাই মত? যদি তাই হয়, তাহলে দয়া করে এখনই বলেন। আমি কোনো রকম খুঁত রাখতে চাই না।'

মজনু চা নিয়ে এল। চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বজলু সাহেব বললেন, 'জিনিস দাঁড়িয়েছে কেমন, বল তো মজনু।'

মজনু দাঁত বের করে বলল, 'ফাটাফাটি জিনিস হইছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'সত্যি না বললে আমি বাপের ঘরের না।'

বজলু সাহেব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন মজনুর কথায় তিনি খুব ভরসা পেলেন।

আসিফের বাসায় ফিরতে রাত এগারটা বেজে গেল। দরজার বেল টিপতেই লীনা এসে দরজা খুলে দিল।

আসিফ হতভম্ব হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

লীনা হাসি মুখে বলল, 'কোনো ব্যাপার না। যেতে ইচ্ছা করল না।'

'যেতে ইচ্ছা করল না মানে? ওরা চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। মা, দুলাভাই খুব রাগারাগি করছিল।'

'যাও নি কেন?'

'ঘরে আস, তারপর বলি।'

আসিফ ঘরে ঢুকল। তার বিস্ময় এখনো পুরোপুরি কাটে নি। লীনা বলল, 'আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?'

'তুমি যাও নি কেন সেটা আগে শুনি।'

'এয়ারপোর্টে যাবার পর হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল একা একা বাসায় ফিরবে। একা একা শুয়ে থাকবে। মনে হতেই চোখে পানি এসে গেল। তারপর চলে এলাম।'

'এইসব কী পাগলামী লীনা!'

'তুমি কি আমাকে দেখে খুশি হও নি?'

'হয়েছি।'

'কতটুক খুশি হয়েছ?'

'অনেকখানি।'

'তাহলে তুমি এখনো আমাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন?'

আসিফ গভীর আবেগে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল।

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'আজ সারাদিন আমার কী মনে হচ্ছিল জান? মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার ভালবাসার মধ্যে অনেকখানি অভিনয় আছে।'

'এখনো কি সে রকম মনে হচ্ছে?'

'না।'

সারারাত দু'জন জেগে রইল। কত অর্থহীন কথা, কত অর্থহীন হাসি। বারবার লীনার চোখে পানি আসছে, সেই পানি মুছে সে হাসছে।

আসিফ বলল, 'একটা গান কর না লীনা।' লীনা শব্দ করে হাসল। হাসতে– হাসতে বলল, 'আমার গান হয় নাকি?'

'এক সময় তো গুনগুন করতে। এখনো না হয় কর।'

'মাঝে–মাঝে কী মনে হয় জান?'

'কী মনে হয়?'

'মনে হয় অভিনয় না করে গান করলে পারতাম। গানের দিকে আমার ঝোঁক ছিল। তোমার জন্যে অভিনয়ে চলে এলাম।'

'তোমার কি মনে হয় ভুল করেছ?'

লীনা তার জবাব না দিয়ে বলল, 'সত্যি গান শুনতে চাও, গাইব?'

'গাও।'

'মাত্র চার লাইন কিন্তু।'

'গান চার লাইনেই ভালো।'

লীনা মৃদুস্বরে গাইল—'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে।' চার লাইন পর্যন্ত যেতেই পারল না। কেঁদে কেটে অস্থির হল। আসিফ বলল, 'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন? আমার প্রায়ই কাঁদতে ইচ্ছে করে। তোমার করে না?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা হঠাৎ করে বলল, 'আমি না যাওয়ায় তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'একবার তো বললাম, খুশি হয়েছি।'

'আরেকবার বল।'

'খুশি হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।'

'না যাবার আরেকটা কারণও আছে। এটা তোমাকে বলি নি, কারণ তোমার মনটা খারাপ হবে।'

'মন খারাপ হবে না। তুমি বল।'

'এ মাসের সতের তারিখে আমাদের বড় মেয়ের মৃত্যুদিন। এই দিনে আমরা দু'জন দু'জায়গায় থাকব, তা কী করে হয়!'

'না, তা হয় না।'

'ঐ দিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে সারাক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকব।'

লীনা চোখের পানি মুছে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার মাঝে–মাঝে কী মনে হয় জান? আমরা যদি আমাদের জীবনের সবচে প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিই, তাহলে হয়ত আমাদের এবারের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে। এক ধরনের সেক্রিফাইস। আমার এই কথায় তুমি কি কিছু মনে করলে?'

দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে আসিফ বলল, 'না, কিছু মনে করি নি। এটা একটা কথার কথা।'

'কথার কথা কেন হবে? তোমার মনের মধ্যে এটা আছে। আছে না?' লীনা চুপ

করে রইল।

আসিফ বলল, 'বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। এক গ্লাস পানি খাওয়াবে?'

লীনা বিছানা থেকে নেমে বাতি জ্বালাল। আর তখনি ওয়ারড্রোবের মাথায় রাখা ছবির ফ্রেম দু'টির দিকে আসিফের চোখ পড়ল। লোপা এবং ত্রপার বাঁধান ছবি। ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ থাকে। কখনো বের করা হয় না। আজ বের করা হয়েছে।

লীনা ছবি দু'টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সতের তারিখের পর আবার লুকিয়ে ফেলব।'

আসিফ বলল, 'লুকিয়ে ফেলার দরকার কি, থাকুক। তুমি যাও, পানি নিয়ে এস।'

আসিফ তাকিয়ে রইল ছবি দু'টির দিকে। আহ্, কী সুন্দর দুই মা–মণি! এক জন আবার রাগ করে ঠোঁট উল্টে আছে। অন্যজন কেমন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। যেন পৃথিবীর রহস্য দেখে তার বিস্ময়ের সীমা নেই।

আসিফের বুক জ্বালা করতে লাগল। ছবি দু'টির দিকে তাকালেই তার অসহ্য কষ্ট হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ত্রপা, ত্রপা মামণি। কেমন আছ গো?'

ত্রপা জবাব দিল না, জবাব দিল লীনা। সে স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'পানি নাও।'

আসিফ এক চুমুকে পানি শেষ করে সহজ গলায় বলল, 'আমি আর অভিনয় করব না লীনা। তোমাকে কথা দিচ্ছি। বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে আলো লাগছে।'

'তুমি কি আমার উপর রাগ করলে?'

'না লীনা। রাগ করি নি।'

'আমি একটা কথার কথা বললাম।'

'বাতি নিভিয়ে দাও লীনা। বাতি নিভিয়ে দাও।'

লীনা বাতি নিভিয়ে দিল।

১১

আসিফদের শো হল না। শো–এর দিন আসিফ এবং লীনা ছাড়া দলের সবাই একত্রিত হল। মজনু বারান্দায় চায়ের কেতলি বসিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'কেউ গিয়ে চড় দিয়ে গাধাটাকে থামাও তো, অসহ্য!' বলতে বলতে তিনি নিজেও কেঁদে ফেললেন। এবং কাঁদলেন শিশুদের মতো শব্দ করে। তাঁকে ঘিরে মূর্তির মতো সবাই বসে রইল। কেউ একটি শব্দও করল না। শুধু পুষ্পকে দেখে মনে হল, যে কোনো মুহূর্তে এই মেয়েটি ভেঙে পড়বে। তবে সে ভেঙে পড়ল না। সাজঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে রইল। বজলু সাহেব যখন বললেন, 'খামোখা বসে আছে কেন সবাই? যাও, বাসায় চলে যাও।' তখনি শুধু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেউ এসে সান্ত্বনার হাত তার মাথায় রাখল না।

কিছুদিন পরই থিয়েটারের এই দলটি নতুন নাটকের মহড়া শুরু করল। নাটকের নাম—হলুদ নদী, সবুজ বন। মজনু আবার তার জাম্বো সাইজের কেতলিতে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। জলিল সাহেব জমিয়ে আদিরসের গল্প শুরু করলেন। বজলু সাহেব

উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সবই আগের মতো, শুধু আসিফ এবং লীনা নেই। এরা দু'জন যেন হঠাৎ উবে গেছে। অথচ সবাই জানে তারা আগের জায়গাতেই আছে, সেই আগের বাসায়। পূর্বা নাট্যদলের যেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি, তেমনি আসিফ এবং লীনারও কোনো পরিবর্তন হয় নি। আসিফ শুধু বলেছে, সে অভিনয় করবে না। কেন অভিনয় করবে না, সমস্যাটা কি—এই কথা পূর্বা নাট্যদলের কেউ জানতে পারে নি। অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। শুধু পুষ্প খানিকটা জানে। তাকে আসিফ একটা চিঠি লিখেছিল।

পুষ্প,

আমার খুব ইচ্ছা ছিল মুখোমুখি কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলি, কেন অভিনয় ছেড়ে দিলাম তা তোমাকে গুছিয়ে বলি। তা সম্ভব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, জানতে চেও না।

দেখ পুষ্প, অভিনয় আমার বড়ই শখের জিনিস। এর কারণে আমি যেমন একদিকে সব কিছু হারিয়েছি, আবার তেমনি অনেক পেয়েছিও। লীনার মতো একটি মেয়েকে পাশে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার, তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আর শুধু কি লীনা? তোমাকেও কি আমি অভিনয়ের কারণেই পাই নি? লজ্জা পেও না পুষ্প, সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। বেশিরভাগ সময়ই আমরা সত্যি কথা লুকিয়ে রাখি, তবু মাঝে-মাঝে বলতে ইচ্ছে করে।

যে কথা বলছিলাম, অভিনয় আমার জীবনের অনেকখানি, কে জানে হয়তো-বা সবখানি। সেই অভিনয় থেকে সরে আসা যে কী কষ্টের, তা মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ। কেন সরে এলাম? পুরোটা তোমাকে বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার এবং লীনার জীবনে একটি গভীর ট্র্যাজিডি আছে। গহীন একটি ক্ষত। লীনার কেন জানি মনে হয়েছে, আমরা দু'জনই যদি বড় কোনো সেক্রিফাইস করি, তাহলে হয়তো বা ট্র্যাজিডির অবসান হবে। লীনার মনের শান্তির জন্যে এইটুকু আমাকে করতেই হবে। অভিনয় তো জীবনের চেয়ে বড় নয়, তাই না?

তোমাকে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু দুঃখের কাঁদুনি গাওয়া নয়। এই জিনিস আমি কখনো করি না। তোমাকে চিঠি লেখার একটিই কারণ, তা হচ্ছে—তুমি যেন অভিনয় ছেড়ে না দাও। অভিনয়ের যে অসম্ভব ক্ষমতা নিয়ে তুমি জন্মেছ, সেই ক্ষমতাকে নষ্ট করো না। সব মানুষকে সব ক্ষমতা দিয়ে পাঠান হয় না। যাদেরকে দেয়া হয়, তাদের উপর আপনাতেই সেই বিশেষ প্রতিভার লালন করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তুমি অনেক বড় হবে পুষ্প। অনেক অনেক বড়। এইটি আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সত্যি-সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে সেদিন আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না, এই কথাটি তোমাকে জানানোর জন্যেই আমার দীর্ঘ চিঠি। ভালো থেক, সুখে থেক।

১২

পনের বছর পরের কথা।

আসিফ তার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে ময়মনসিংহে আসছেন। মেয়েটির বয়স চোদ্দ। তার নাম চন্দ্রশীলা। অসম্ভব চঞ্চল মেয়ে। এক দণ্ডও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। ট্রেনে সারাক্ষণ বকবক করেছে। তার মাথায় একটা রঙিন স্কার্ফ বাঁধা ছিল, জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করায় হাওয়ায় সেই স্কার্ফ উড়ে চলে গেছে। লীনা খুব রাগ করেছেন। সেই রাগ অবশ্যি চন্দ্রশীলাকে মোটেই স্পর্শ করে নি। সে বাবার গায়ে হেলান দিয়ে কি একটা বই পড়ে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। লীনা বললেন, 'এসব কী হচ্ছে? চুপ করে ভদ্রভাবে বস না।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'তুমি নিজে চুপ করে ভদ্রভাবে বসে থাক তো মা, আমাকে বকবে না। এম্নিতেই স্কার্ফ হারিয়ে আমার মনটা খারাপ।'

লীনা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেই সব কঠিন কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েটা অবিকল ত্রপার মতো হয়েছে। কঠিন কিছু বললেই নিচের ঠোঁট উল্টে ফেলে।

আসিফ সাহেব বললেন, 'বই টই সব ব্যাগে গুছিয়ে ফেল মা, এসে পড়েছি।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম কেন বাবা? আমার নামতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী করতে ইচ্ছা হচ্ছে?'

'ট্রেনেই থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। আচ্ছা বাবা, সারাজীবন যদি আমরা ট্রেনে-ট্রেনে থাকতাম, তাহলে ভালো হত না?'

'হ্যাঁ, ভালোই হত।'

স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। আসিফ সাহেব অনেক কষ্টে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে নামলেন। ভিড় ঠেলে এগুতে পারছেন না, এমন অবস্থায় লীনা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

আসিফ বললেন, 'মনে হচ্ছে বিখ্যাত কেউ ট্রেন থেকে নেমেছেন। লোকজনদের হাতে প্রচুর মালা-টালা দেখা যাচ্ছে।'

চন্দ্রশীলা বাবার হাত ধরে সাবধানে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে। সে আড়ে-আড়ে ভীত চোখে মার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ ভিড়ের চাপে তার বাঁ পায়ের স্যান্ডেলটি সে হারিয়ে ফেলেছে। মা জানতে পারলে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। চন্দ্রশীলার ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া। একটা স্যান্ডেল গিয়েছে তো কী হয়েছে? আরেক জোড়া কিনলেই হবে। এই জোড়াটা এম্নিতেও তার পছন্দ না। ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙ। সে এবার মেরুন রঙের স্যান্ডেল কিনবে।

চন্দ্রশীলা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। হতভম্ব হয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'বাবা দেখ, ট্রেন থেকে কে নামছেন দেখ। পুষ্প, পুষ্প। বাবা, উনি পুষ্প না? কী আশ্চর্য, আমরা এক ট্রেনে এসেছি!'

আসিফের কাছে ভিড়ের রহস্য স্পষ্ট হল। আজকের পত্রিকায় অবশ্যি ছিল—পুষ্প ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে যাবে। সেখানে কি একটা অনুষ্ঠান করার কথা।

'বাবা, উনি কি পুষ্প?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, উনি কি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?'

'এই ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে যাবার কোনো উপায় নেই মা।'

পুষ্প বিরাট একটা কালো চশমায় চোখ ঢেকে রেখেছে। তাঁকে ঘিরে আছে বলিষ্ঠ কিছু ছেলেমেয়ে, যেন কেউ কাছে যেতে না পারে। তবু লোকজন এগুতে চেষ্টা করছে।

'বাবা একটু দেখ না, ওনার একটা অটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না। আমার খুব শখ। উনি দেখতেও তো খুব সুন্দর, তাই না বাবা?'

আসিফ মেয়েকে নিয়ে ভিড় ঠেলে কাছে যেতে চেষ্টা করছেন। লীনা একা-একা দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছেন। তাঁর চোখ জ্বালা করছে। জল আসবার আগে-আগে চোখ এমন জ্বালা করে।

আসিফ মেয়েকে নিয়ে পুষ্পের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। চন্দ্রশীলা ছোট নোটবুক উঁচু করে ধরে আছে।

পুষ্প তার হাত থেকে নোটবুক নিয়ে দ্রুত কী সব লিখে নোটবুক ফেরত দিল। চোখের কালো চশমা খুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল আসিফের দিকে, তারপর সবাইকে হতভম্ব করে নিচু হয়ে তাঁর পা স্পর্শ করল। পরমুহূর্তেই এগিয়ে গেল সামনে। মানুষের ভিড় বড়ই বাড়ছে। স্টেশন থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তার দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই।

চন্দ্রশীলা কান্না-কান্না গলায় বলল, 'বাবা, উনি তোমাকে চেনেন? তুমি তো কোনোদিন বল নি। তুমি এরকম কেন বাবা?'

অভিমানে তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেছে। চোখে জল টলমল করছে। হয়ত সে কেঁদে ফেলবে। এই বয়সী মেয়েরা অল্পতেই কেঁদে ফেলে।